বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর ১৯

অনুসারে ষষ্ঠ

ইতিহাস পরিচয়



ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর ১৯৭৮ সালের বিঘোষিত নূতন পাঠ্যসূচী
অনুসারে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য লিখিত।

ইতিহাস পরিচয়

ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য

লীলা পুরকায়স্থ, এম্. এ, বি. টি,
প্রধান শিক্ষিকা, ঘাটেশ্বর বালিকা বিদ্যালয় (হাইস্কুল),
চব্বিশ পরগণা।

পাইওনিয়ার পাবলিশার্স
৪৪/১ বি, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ : মে, ১৯৭৯

প্রকাশক :
অনিমেষ ভট্টাচার্য
পাইওনিয়ার পাবলিশার্স
৪৪/১ বি, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা- ৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
সুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদ ও চিত্রশিল্পী :
শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ রায়

ব্লকনির্মাণ ও প্রচ্ছদমুদ্রণ :
প্রোসেস সিণ্ডিকেট
কলিকাতা- ৭০০০০৬

মূল্য : পর্ষৎ কর্তৃক নির্ধারিত

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর নির্দেশিত ১৯৭৮ সালের নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই ইতিহাস বইখানি লিখিত হয়েছে।

সুদীর্ঘকাল ধরে যে পাঠ্যসূচীর ধারা প্রচলিত ছিল তাতে একটি সুচিন্তিত পরিবর্তন আনা হয়েছে; মানবজাতির সমাজ ও সভ্যতার ক্রম-বিকাশের চিত্রটি কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরাই হচ্ছে নূতন পাঠ্যসূচীর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে আদিমকাল থেকে মানুষের সভ্যতার উদ্ভব, অগ্রগতি ও বিকাশকে হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্যভাবে কিশোর-কিশোরীদের কাছে হাজির করতে আমরা চেষ্টা করেছি। সমাজাবস্থার অঙ্গ হিসাবে ইতিহাস পাঠকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে চেষ্টার কোনো ত্রুটিই আমরা করিনি। প্রতিটি বিষয়কে নানাবিধ ছবি ও মানচিত্রের সাহায্যে মনোগ্রাহী করে তুলতে আমরা চেষ্টা করেছি এবং দেশী-বিদেশী আচার্যবৃন্দের প্রাসঙ্গিক লেখা ও রচনা থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে আমরা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গ্রহণ করেছি।

আমাদের বিশ্বাস, ইতিহাসের পাঠ্যসূচীর এই নূতন বিন্যাস একটি সুস্থিত রূপ লাভ করবে এবং ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে তাতে করে এক নূতন অধ্যায়েরই সূচনা হবে।

পাইওনিয়ার পাবলিশার্স-এর শ্রীঅনিমেষ ভট্টাচার্য ও তাঁর সহকর্মী শ্রীকমল ভট্টাচার্য এবং কৃতী-শিল্পী শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ রায় বইখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি। তারজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। শ্রীগোপাল প্রেসের পরিচালক ও কর্মীদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ, একটি কঠিন পরিস্থিতিতে বইখানির প্রকাশ তাঁদের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

আমাদের **'ইতিহাস পরিচয়'** বইখানি সুধী শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের সুচিন্তিত, সহৃদয় অনুমোদন লাভে সমর্থ হবে আশা করি। এই বইখানির উন্নতিবিধায়ক যেকোনো প্রস্তাব ও সমালোচনা আমরা সাবনয়ে গ্রহণ করব। যে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বইখানি লিখিত হয়েছে তারা যদি তাকে সাগ্রহে গ্রহণ করে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

কলিকাতা
১৫ই মে, ১৯৭৯

বিনীত,
লীলা পুরকায়স্থ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস পাঠের ভূমিকা ১

দ্বিতীয় অধ্যায় ৬

এক : আদিম মানুষের কথা ; পৃ : ৬ / **দুই** : প্রাচীন প্রস্তর যুগ ; পৃ : ৯ / **তিন** : নূতন প্রস্তর যুগ ; পৃ : ১১

তৃতীয় অধ্যায় ১৮

তামা ও ব্রোঞ্জের যুগ

চতুর্থ অধ্যায়

পৃথিবীর আদিম সভ্যতা সমূহ ২৩

এক : মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতা ; পৃ : ২৫ / **দুই** : মিশরের প্রাচীন সভ্যতা ; পৃ : ৩০ / **তিন** : প্রাচীন ভারতের সিন্ধু সভ্যতা ; পৃ : ৪১ / **চার** : চীনের প্রাচীন সভ্যতা ; পৃ : ৪৯ / **পাঁচ** : পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো ; পৃ : ৫৪

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহ যুগ : পৃথিবীর নানা অঞ্চলের সমাজ-জীবন ৫৮

এক : ব্যাবিলন-এর সভ্যতা ; পৃ : ৬০ / **দুই** : প্রাচীন মিশরের রাজতন্ত্র ; পৃ : ৬৫ / **তিন** : পারস্যে রাজশক্তির উদয় ও ক্ষমতা বিস্তার ; পৃ : ৭০ / **চার** : মোজেস-এর নেতৃত্বে ইহুদিদের মুক্তি অভিযান ; পৃ : ৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রীস দেশের সভ্যতা ৭৭

সপ্তম অধ্যায়

রোমান সাম্রাজ্য ৯৬

অষ্টম অধ্যায়

চীন : সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুগ ১০৮

নবম অধ্যায়

ভারতের ইতিহাস ১১২

অনুশীলনী ও বিষয়মুখী প্রশ্নের আদর্শ

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস পাঠের ভূমিকা

ইতিহাস কাকে বলে? ইতিহাস আমরা পড়ি কেন? ইতিহাস পড়ে কী লাভ? ইতিহাসের বই হাতে নিয়ে এসব কথা নিশ্চয়ই মনে জাগে। পুরনো দিনের কাহিনীই হল ইতিহাস। অতীতের কাহিনী যা থেকে আমরা জানতে পারি তাকেই আমরা বলি **ইতিহাস**। ইতিহাসের কাহিনী কিন্তু মনগড়া কিছু কাহিনী, বানিয়ে-বলা কিছু গল্প-কথা নয়। যা ঘটেছে ইতিহাস তারই ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়, তাকে ঠিক ঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করে। ইতিহাসের কথা যাঁরা লেখেন তাঁদের বলা হয় ইতিহাসজ্ঞ বা ঐতিহাসিক। একজন ঐতিহাসিককে তাই খুবই পরিশ্রমী হতে হয়, যে-কোনো কথা লেখার আগে সেই ঘটনাগুলোকে তাঁর খুব ভালো করে নির্ভুলভাবে জানতে হয়, বিচার করে মিলিয়ে নিতে হয় প্রকৃত তথ্য ও বাস্তব ঘটনার সঙ্গে। ইতিহাস-লেখকের প্রতিটি বক্তব্যের পক্ষে তাই নানা রকমের তথ্য-প্রমাণের দরকার হয়। ইতিহাস পড়ে অতীত দিনের মানুষ কিভাবে জীবনধারণ করতেন তা আমরা জানতে পারি। আর ভবিষ্যতে কিভাবে চললে আমাদের ভাল হবে তা আমরা ইতিহাস পড়েই বুঝতে পারি। অতীতের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের পথচলার সময় আমাদের কাছে আলোর মত কাজ করে, আমাদের পথ দেখায়। এই হচ্ছে ইতিহাস পড়ার লাভ এবং তারই জন্য আমরা ইতিহাস পড়ি।

অতীতের কথা বলতে গেলেই নানা রকম ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি বলি গত বছর তোমাদের স্কুলে কত ছাত্র ছিল তবে তা ঠিকঠিকভাবে জানতে হলে স্কুলের অফিস থেকে ছাত্রদের নামের

তালিকা দেখে হিসেব করে তবেই তা সঠিকভাবে জানা যাবে। আন্দাজে একটা কিছু সংখ্যা বলে দিলেই চলবে না। কিন্তু ঘটনা যদি অনেক আগের হয় ? পাঁচ, দশ বা একশ বছরের পুরনো হয় তবে সে সম্পর্কে সঠিকভাবে বলা খুবই কঠিন হবে। তখন ঐ সময়ের লিখিত কাগজপত্র ঘেঁটে তবে সে সম্পর্কে জানতে হবে এবং সঠিক-ভাবে জানতে পারলেই ঠিকঠিক ভাবে বলা যাবে।

কিন্তু প্রাচীনকালের ইতিহাস পড়তে গিয়ে যদি আমরা হাজার হাজার বছর আগেকার কথা জানতে চাই তাহলে যে কী রকম অসুবিধে হবে, তা সহজেই বোঝা যাবে। কারণ ঐ সময়ের কোনো কথা বইপত্রে তো লেখা নেই। যদি পুরনো কোনো বইপত্র পাওয়াও যায় তা বোঝা কঠিন হয়, কেননা তার ভাষা আমাদের ভাল জানা নেই। অথচ ইতিহাস হচ্ছে সেই প্রাচীনকালে মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করতেন তার কথাও জানা। কোন না কোন ভাবে প্রাচীনকালের মানুষ নিজেদের কথা লিখে রেখেছেন এমন যে দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে তা আনুমানিক প্রায় দু হাজার পাঁচশ বছর আগেকার। খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বছর আগের লেখা চীন দেশে পাওয়া গেছে। ইতিহাস-লেখকদের কাছে খৃষ্টের জন্মের বছরটি সাধারণভাবে 'প্রথম বছর' বলে গণ্য হয়। তাই কোনো পুরনো ঘটনা, কত পুরনো তা বোঝাবার জন্য খৃষ্ট-পূর্বাব্দ বা সংক্ষেপে 'খৃঃপূঃ' এভাবে বছরটিকে চিহ্নিত করা হয়। যেমন ইতিহাসের বইয়ে দেখবে, আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণের সময়কে ৩২৬ খৃঃপূঃ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ; অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের ৩২৬ বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল।

একেবারে শুরু থেকেই আদিম মানুষের কথা আমরা জানতে চাই। কী করে তারা বড় হয়ে উঠেছেন, প্রকৃতির শক্তিকে ধীরে ধীরে কাজে লাগিয়ে কিভাবে তারা সভ্যতা গড়ে তুলেছেন সে সব কথাই আমরা জানতে চাই। ঐ সময়ের কোনো লিখিত ইতিহাস

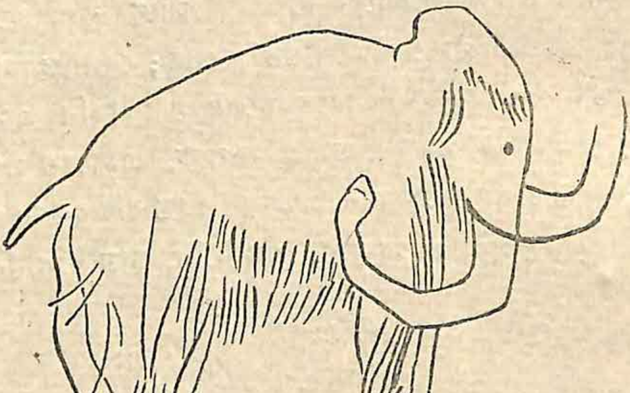
নেই ; অথচ খৃষ্টের জন্মের হাজার হাজার বছর আগে থেকেই মানুষের জীবনযাপনের কথা, তাদের এগিয়ে চলার কাহিনী আমরা জানতে চাই। যে যুগের লিখিত কোনো তথ্য বা কাহিনী নেই তাকে বলা হয় প্রাক-ইতিহাস অর্থাৎ লিখিত ইতিহাসেরও আগেকার কথা। সেই অতি-অল্প-জানা কথাগুলোকে ঐতিহাসিকেরা অনেক চেষ্টা করে ধীরে ধীরে জানতে পেরেছেন। সেই ইতিহাসের আগের কাহিনী অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক দিনগুলো থেকে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে মানুষ যে সব সভ্যতা গড়ে তুলেছেন সে সব কথা এখন ইতিহাস পড়ে আমরা জানতে পারি। অনেক কথা আমরা জেনেছি ; এখনও অনেক কথা অ-জানা রয়ে গেছে। সারা দুনিয়ার পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলে একত্রে কঠোর পরিশ্রম ক'রে সে সব অজানা কথা সংগ্রহ করছেন।

অতীত দিনের, অনেক পুরনো দিনের কাহিনী কী করে জানা যায়? আমরা আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণের কথা শুনেছি। ঐ সময়ের একজন গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত ছিলেন ; মেগাস্থিনিস তাঁর নাম। তিনি বেশ কিছুকাল ভারতে ছিলেন এবং তিনি একখানি বই লিখেছেন। ঐ সময়ের ভারত সম্পর্কে, গ্রীসদেশ সম্পর্কে অনেক কথা তাঁর বই থেকে জানা গেছে। কিন্তু যদি বই না থাকে তবে ঐ সময়ের কোনো ধাতুর মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রলিপি, বিভিন্ন



স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা নানা লেখা থেকেও ঐ সময়ের কথা

জানা যায়। ঐ সময়ের খবর মানুষের ব্যবহৃত নানা হাতিয়ার ও অন্যান্য জিনিসপত্র থেকে জানা গেছে। মাটির নীচের থেকে নানা মুদ্রা, তাম্রলিপি ইত্যাদি পাওয়া যায় ; ঐ সময়ের ঘর-বাড়ি, প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদিও পাওয়া যায়। এই যে 'মাটির-তলার-খবর খনন-করে-জানা' তাকে বলে **পুরাতত্ত্ব** বা **প্রত্নতত্ত্ব**। এই সব খননকার্যের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশেই আমরা জেনেছি, মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পার প্রাচীন কালের 'সিন্ধুসভ্যতার' কথা। একই ভাবে জানা গেছে 'মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার' কথা। মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের কথা জানা গেছে মিশরের 'পিরামিড'-গুলোতে প্রাপ্ত জিনিসপত্র থেকে ও গ্রীসের ইতিহাসের নানা কথা জানা গেছে ঐ দেশের প্রাসাদ ও নানা জিনিসের ভগ্নাবশেষ থেকে। তাছাড়া আরো প্রাচীন কালের কথা জানা গেছে মাটির তলায় বা

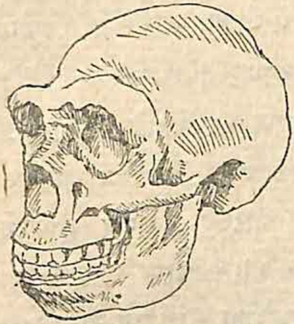


আদিমকালের হিংস্র প্রাণী

পাহাড়-পর্বতের গায়ে পাথর-চাপা নানা জীবজন্তুর 'ফসিল' বা তাদের হাড়-পাঁজরের ভগ্নাবশেষ থেকে।

এক কথায়, অতীতের হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলোর কথা অনেক পরিশ্রম করে ও অর্থব্যয় করে ঐতিহাসিকেরা জেনেছেন, জানছেন।

এভাবে প্রাচীন কাল থেকে ইতিহাসের নানা যুগের কথা ক্রমে ক্রমে জানা গেছে। সারা পৃথিবীর মানবজাতির সেই অগ্রগতির



আদিম মানুষের মাথার খুলি



শিল্পীর কল্পনায় মাথার খুলি থেকে মানুষের চেহারা

কথা, তাদের সভ্যতা গড়ে তোলার কথাই আমরা ইতিহাস পড়ে জানতে পারব।

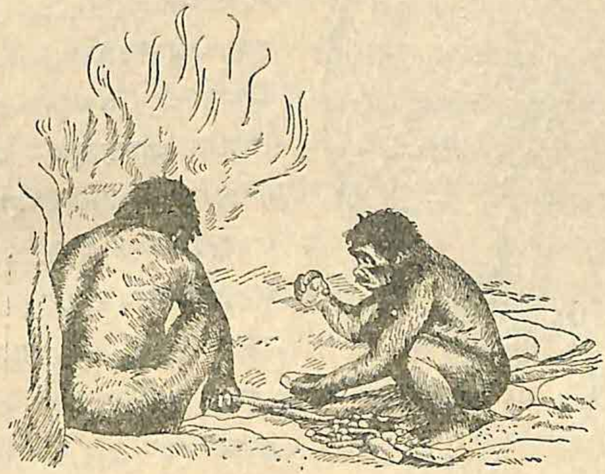
দ্বিতীয় অধ্যায়

এক ॥ আদিম মানুষের কথা

আদিম কালে মানুষ কেমন করে জীবন যাপন করতেন, কেমন করে তারা বেঁচে ছিলেন ?—সে সম্পর্কে কোন লিখিত বিবরণ নেই। তবে এ কথা আমরা সবাই জানি বাঁচতে হলে প্রত্যেকটি প্রাণীকেই খেতে হয় এবং সেই খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। আদিম কালেও মানুষকে খাদ্য জোগাড় করতে হয়েছে। গাছের ফলমূল কুড়িয়ে আনতে হয়েছে, জীবজন্তু শিকার করে তার মাংস খেতে হয়েছে বা জল থেকে মাছ ধরে খেতে হয়েছে। গাছে তো আর সব সময় ফল ধরে না, তার একটা সময় আছে। বছরের এক এক সময় এক এক রকম ফল পাওয়া যায়। শিকার করার মত জীবজন্তু ও পশুপাখি সব সময় পাওয়া যায় না। আবার পেলেও সেগুলো শিকার করা সহজ কাজ নয়। শিকার যদি পাওয়া যায় তবু পশুপাখিকে কি চিবিয়ে খেয়ে নেওয়া যায়? তার জন্য মাংসকে আগুনে ঝলসে নেওয়ার দরকার হয়। এভাবে খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য আগুনের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মানুষের ইতিহাসে আগুনের আবিষ্কার ও ব্যবহার তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা।

পাহাড়ে-জঙ্গলে গরমের দিনে গাছে গাছে ঘর্ষণের ফলে অনেক সময় আগুন জ্বলে ওঠে। প্রাকৃতিক কারণে পাহাড় জঙ্গলে যখন আগুন জ্বলে ওঠে তাকে বলে 'দাবানল'। আগুনে পড়লে প্রাণীরা পুড়ে মরে যায়, আগুন তাই খুবই ভয়ের জিনিস। অথচ আগুন না হলে আমাদের একেবারেই চলে না। আদিম কালের মানুষেরও চলত না। তাই সবসময় আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য মানুষ চেষ্টা করতেন। বৃষ্টির জলে আগুন নিভে যায়। তার জন্য আদিম

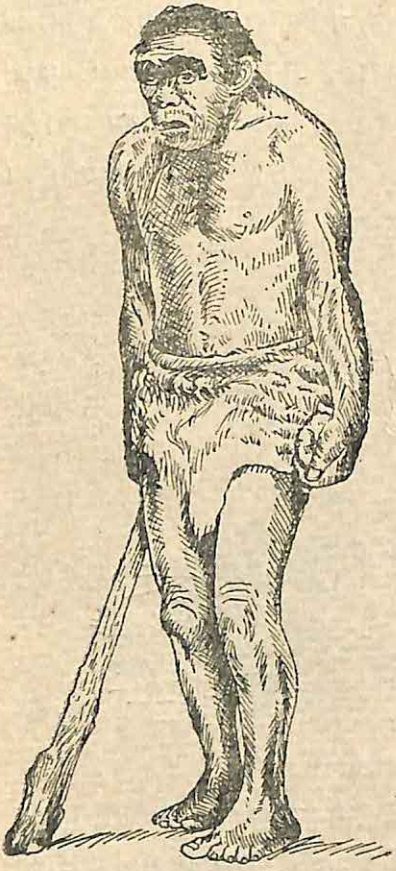
কালেও মানুষ ইচ্ছামত আগুন জ্বালাবার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করতেন। পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাবার পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হয়। পণ্ডিতদের অনুমান, খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিনলক্ষ বছর আগে সেই প্রাগৈতিহাসিক কালেই চীন দেশের পিকিং অঞ্চলে বসবাসকারী 'পিকিংম্যান' নামক আদিম মানুষেরা প্রথম আগুন ব্যবহার করেছিলেন। এক হিসেবে বলা যায়, সেটাই ছিল আদিম মানুষের সভ্যতার পথে প্রথম পদক্ষেপ।



আদিম মানুষের আগুন জ্বালানো

কিন্তু ঐ যুগে আগুন জ্বালানো, শিকার করা বা ফলমূল সংগ্রহ করার কাজ তো মানুষ একা একা করতে পারতেন না। ভীষণ একটা বিপদের অবস্থা ছিল চারদিকে। হিংস্র জীবজন্তুরা সবসময় মানুষকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করত। মানুষের হাতে হাতিয়ার নেই, তাই দল বেঁধে সবাইকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করতে হত। খালি হাতে শিকার হয় না। তাই আদিম মানুষেরা অনেকে মিলে পাথর চাপা দিয়ে প্রথমে জন্তুদের শিকার করতেন। ছোট ছোট পাথর ছুড়ে শিকারের চেষ্টা করতে হত। তারপর এই পাথরগুলোকে ঘষে ঘষে ছুঁচোলো বা ধারালো করে নেওয়ার চিন্তা এল মানুষের মাথায়।

এই সব চিন্তাই মানুষকে করতে হয়েছে বেঁচে থাকার জন্য। এভাবে ছোট ছোট দলবদ্ধ মানুষের 'গোষ্ঠী' গড়ে উঠেছে। নানান অঞ্চলে ছিল নানা গোষ্ঠীর বাস। আবার তাদের নানা গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি, হানাহানির শেষ ছিল-না। এই ছিল অবস্থা। কিন্তু সকলেরই সম্বল ছিল ঐ পাথর বা পাথরের তৈরি ধারাল হাতিয়ার। এই জন্য ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই যুগকে বলেছেন **'প্রস্তর যুগ'**। মানুষ ঐ সময়ে শুধু পাথরের হাতিয়ারই ব্যবহার করতে জানতেন। ধাতুর ব্যবহার তখনও অজানা ছিল। এই 'প্রস্তর যুগকে' আবার 'প্রাচীন প্রস্তর যুগ' ও 'নূতন প্রস্তর যুগ' এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যখন পাথরের হাতিয়ারগুলো প্রায় প্রাকৃতিক অবস্থাতেই ব্যবহৃত হত তাকে বলা হয় 'প্রাচীন প্রস্তর যুগ', আর যখন সেই পাথরগুলো ঘষে ঘষে ধারাল করে, তাতে ছেদা করে বা আঘাত করার উপযোগী করে হাতিয়ারে পরিণত করা গেছে বা উন্নততর করা গেছে তখন তাকে বলা হয় 'নব্য প্রস্তর যুগ' অর্থাৎ নূতন বা উন্নত পাথরের হাতিয়ারের যুগ। এভাবে প্রাচীনকালের হাতিয়ারের ধরন থেকে ঐ সময়ের সভ্যতার উন্নতি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।



আদিম অস্ত্র হাতে আদিম কালের মানুষ

অতি সহজেই 'হাত' আর 'হাতিয়ার' কথা দুটির মধ্যে মিল বোঝা যায়। হাত দিয়ে আমরা কাজ করি, আর হাতিয়ার আমাদের হাতের কাজে সাহায্য করে, তাই তাকে বলি 'হাতিয়ার'। হাত দিয়ে একটা পেন্সিল কাটতে পারি না, ছুরি দিয়ে তা কাটতে পারি; ছুরি তাই হাতিয়ার। কিন্তু আদিম মানুষ লোহার ব্যবহার জানতেন না, তাই তাদের ছুরিও ছিল না। তাদের সম্বল ছিল একমাত্র পাথর বা কাঠের টুকরো। তাই এই পাথরকেই ঘষে মেজে অনেক কষ্টে ধারাল করে তার হাতিয়ার হিসেবে আদিম মানুষকে ব্যবহার করতে হয়েছিল। ঐতিহাসিকেরা তাই সঠিকভাবে এই যুগকে 'প্রস্তর যুগ' বলেছেন। ঐ আদিম যুগের যে সব অস্ত্রপাতির নমুনা পাওয়া গেছে তার দিকে তাকালেই ব্যাপারটি ভালো বোঝা যাবে।



প্রাচীন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

দুই ॥ প্রাচীন প্রস্তর যুগ

আদিম মানুষের কাছে প্রাচীন প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলো ছিল কোনমতে শিকার করার ও আত্মরক্ষার হাতিয়ার মাত্র। পুরনো প্রস্তর যুগের মানুষ মুখ্যতঃ ছিলেন খাদ্য সংগ্রহকারী; খাদ্যের উৎপাদন করতে তখনও তাঁরা জানতেন না।

'নব্য প্রস্তর যুগে' পাথরের হাতিয়ারগুলো উন্নততর হয়েছে।



সেই সময়ে শুধু হাতিয়ারের পরিবর্তন ঘটল তাই নয়, এমন দু'টি ঘটনা ঘটল যা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—একটি হচ্ছে বন্য পশুপাখিকে জীবন্ত ধরে এনে পোষ-মানানো এবং অন্যটি হচ্ছে অত্যন্ত প্রাথমিক ধরনের হলেও ফলমূলের চাষ করতে শেখা।



সারা দুনিয়াতে প্রাচীন প্রস্তর যুগের যে সব হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে তার ভিত্তিতে পণ্ডিতেরা বলেন প্রাচীন প্রস্তর যুগ শুরু হয়েছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে এবং নূতন প্রস্তর যুগ শুরু হয়েছিল খৃষ্টের জন্মের প্রায় আট বা দশহাজার বছর আগে।







প্রাচীন প্রস্তর যুগের এই প্রায় পাঁচলক্ষ বছরের ইতিহাসে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে আগুনের আবিষ্কার ও তাকে ব্যবহার করার সময় থেকে একটা নূতন অধ্যায় শুরু হয়েছে বলা যায়। এর আগে প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ 'বর্বর-যুগে'ই ছিলেন: মানুষের জীবন আর পশুর জীবনের মধ্যে পার্থক্য ছিল অতি অল্প। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে প্রাচীন প্রস্তর যুগের জীবনধারায় নানা পার্থক্য ছিল। তবে

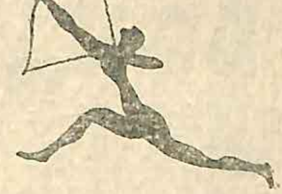




প্রস্তর যুগের নানা প্রকার হাতিয়ার ও অস্ত্রপাতি

আগুনের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর না করে মানুষ যখন নিজেই আগুন তৈরি করতে শিখল তখন আগুনের সাহায্য নিয়ে মানুষ অনেক স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারল। আগুনের ব্যবহার আদিম মানুষের কাছে প্রবল শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠল।

আগুনের আবিষ্কার ও ব্যবহারের পরবর্তী প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রায় তিনলক্ষ বছরে আদিম মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের হাতিয়ারগুলো আদিম মানুষের একটানা চেষ্টার ফলে অনেক উন্নত হয়েছে। পাথরের কুড়ালের সঙ্গে হাতল লাগিয়ে তাকে তারা অনেক কার্যকর করে তুলতে পেরেছেন। ফলে শিকার করা সহজতর হয়েছে। জীবজন্তুর চামড়া ছাড়িয়ে নিতে তারা শিখেছেন ও পশুর চামড়াকে শুকিয়ে লজ্জা নিবারণের কাজে ব্যবহার করতে শিখেছেন—ছুঁচোলো পাথরকে ধনুকের তীর হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছেন। এভাবে একদিকে দূর থেকে শিকার করতে শেখা এবং ধারাল পাথরকে মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যবহার করতে শেখার মধ্য দিয়ে আদিম মানুষেরা প্রাথমিক চাষবাস করতে শিখলেন। প্রচুর শিকার করার এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে আদিম মানুষেরা পশুপাখিকে পোষ মানাতে শিখলেন। প্রাচীন প্রস্তর যুগের এই দু'টি ঘটনা থেকে আদিম গুহাবাসী মানুষের জীবনে নতুন এক যুগের সৃষ্টি হল। মানুষের ইতিহাসে এল নতুন প্রস্তর যুগ।



তীর ধনুক দিয়ে শিকার

তিন ॥ নতুন প্রস্তর যুগ

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন একেবারে আদিম কালে মানব-জাতির মধ্যে হাতিয়ারের বড় একটা ব্যবহার ছিল না। খালি হাতে

যে সব খাদ্য সংগ্রহ করা যায় তাই তাঁরা খেতেন। শুধু বাঁশ ও কাঠের লাঠি বা পাথরের টুকরোই ছিল তাঁদের একমাত্র হাতিয়ার। তার পরে আসে প্রাচীন প্রস্তর যুগ। তখন মানুষ মোটামুটি হাতিয়ার তৈরী করা শিখেছেন। প্রাচীন প্রস্তর যুগে পাথরকে অন্য পাথরে ঘষে যথাসম্ভব মসৃণ আর ধারালো করে নেওয়া হত যাতে ঐ পাথর দিয়ে কোনো কিছুকে কাটা বা চাঁছা যায়। প্রাচীন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার দেখতে ছিল অনেকটা বাদামের মতো। শিকার করা যায়, ঘা মারা যায় বা কোন কিছু কাটা যায়। প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষের দিকে পাথরের মধ্যে ছেদা করে হাতল লাগিয়ে তাকে আরো উন্নত করা হয়। একে বলা চলে এক ধরনের পাথরের কাটারী। খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার—দুটোই এর ফলে সহজ হয়। আদিম কালের মানুষের বসবাসের অঞ্চলে বুড়ো এবং শিশু পশুর হাড়গোড় পাওয়া গেছে। এ থেকে পণ্ডিতদের অনুমান আদিম মানুষেরা পশুর পালের মধ্য থেকে বৃদ্ধ ও শিশু অর্থাৎ দুর্বল পশুগুলোকে জীবন্ত ধরে এনে পোষ মানাতে শুরু করেন। শিকারের যুগ থেকেই আদিম মানুষের সমাজে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শ্রমের পার্থক্য বা বিভাগ শুরু হয়। পুরুষেরা শিকারে যেতেন আর মেয়েরা বাড়িতে থেকে ফলমূল সংগ্রহ ও ঘরের কাজ করতেন। তবু আদিম শিকারী



আদিম মানুষ গুহার দেয়ালে ছবি আঁকছেন। এ থেকে তাঁর শিল্পকলার প্রতি টান এবং প্রিয় পশুপালনের ইচ্ছাই প্রকাশ পাচ্ছে

মানুষের জীবন ছিল একটা যৌথ জীবন ; এ জীবন ছিল সকলের মিলেমিশে চলার সমতার জীবন—সকলে মিলে যথাসাধ্য পরিশ্রম করে একত্রে বেঁচে থাকার চেষ্টা। অসহায় মানুষের বাঁচার জন্য এই ছিল সেই সময়ে আদিম মানুষের সামনে একমাত্র উপায়। সমাজে মানুষের অবস্থা ছিল খুবই দুর্বল, প্রকৃতিকে বশে আনার ক্ষমতা ঐ আদিম মানুষের ছিল না বললেই চলে।

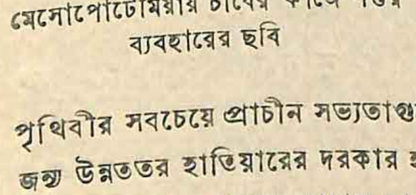
নতুন প্রস্তর যুগের কাছাকাছি সময়ে মানুষের হাতিয়ারের আরো উন্নতি হয়। পাথরের বর্শা, কোদাল, কাঠের ধনুক ও ছুঁচোলো পাথর লাগানো তীর ইত্যাদির ব্যবহার শুরু হয়। ধীরে ধীরে মানুষের বাসস্থান বা গুহাগৃহ গড়ে উঠতে থাকে। তার আগে মানুষ গাছেই রাত কাটাতে বাধ্য হত এবং আদিম মানুষেরা গাছে চড়ার ব্যাপারে খুবই পটু ছিলেন। একদিকে হাতিয়ারের উন্নতি আর আগুনের ব্যবহার প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন নিয়ে আসতে লাগল। আদিম মানুষের গুহাগৃহ-গুলোর কাছে ছাই, কাঠকয়লা, পোড়ানো হাড়গোড় পাওয়া গেছে। দাবানল থেকে মানুষ প্রথমে আগুন সংগ্রহ করতে শিখলেও আগুন উৎপাদনের কৌশল তখনও তাদের জানা ছিল না। আগুনকে কখনও তাঁরা নিভতে দিতেন না। সব সময় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত। রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে রেখে বন্য জন্তুর উপদ্রবের মধ্যেও তাঁরা অনেকটা নিরাপদে বাস করতে পারতেন।

এইভাবে আদিম মানুষের জীবনে নূতন প্রস্তর যুগের সূত্রপাত হয় আট বা দশহাজার বছর আগে।

নূতন প্রস্তর যুগে একদিকে মানুষের হাতিয়ারপাতির উন্নতি হয়েছে, পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাবার কৌশলও তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, নিহত পশুর চামড়াকে শুকিয়ে লজ্জা নিবারণ ও শীতের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য তা তাঁরা ব্যবহার করতে শিখেছেন, বন্যজন্তু ও পশুপাখিকে বেছে বেছে পোষ মানাতে

শিখেছেন, মাটি খুঁড়ে প্রাথমিক চাষবাস রপ্ত করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে নদী ও জলাভূমি থেকে মাছ ধরে তাঁরা সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে বা সিদ্ধ করে খেতে শিখেছেন; অর্থাৎ একধরনের রান্নাবান্না তখন তাঁরা শিখে নিয়েছেন। পাথরের চ্যাপ্টা পাত্র বা মাটির নানা আকারের পাত্র তাঁরা তৈরি করতে শিখেছেন। এই সব কিছুই অত্যন্ত আস্তে আস্তে ঘটেছে—শতশত বছরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে এই প্রতিটি ঘটনাই মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক একটি বিরাট বিরাট ব্যাপার। বলা যায় এই অগ্রগতির মধ্য দিয়েই পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর ভিত্তি গড়ে উঠেছে।

চাষবাস করতে হলে আর ঘুরে বেড়ানো চলে না। যেখানে গাছটি রোপণ করলাম তার কাছাকাছিই তো আমাদেরকে থাকতে হয়। মাছ ধরতে গেলে হয় নদীর তীরের কাছাকাছি বা হ্রদের কাছাকাছি থাকতে হয়। এ একটা মজার ব্যাপার। পৃথিবীর সব ক'টি প্রাচীন সভ্যতা ঠিক এই সব কারণেই বড় বড় নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছে। মিশরে নীলনদের তীরে, মেসোপোটেমিয়ায় তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরে, ভারতে সিন্ধুনদের তীরে, এবং চীনে হোয়াং হো নদীর তীরে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল। চাষবাসের জন্য উন্নততর হাতিয়ারের দরকার হল। নব্য প্রস্তর যুগেই লাঙলের আবিষ্কার হল, পাথরের ধারাল ফাল লাগিয়ে মাটি চাষ করা শুরু হল। তার অনেক পরে লাঙল টানার জন্য পোষ-মানা পশুর ব্যবহার শুরু হল। পোষা পশুকে ইচ্ছেমতো কেটে না খেয়ে তাকে চাষের কাজে লাগানোর এই সম্ভাবনা গৃহপালিত পশুর প্রতি



মেসোপোটেমিয়ায় চাষের কাজে পশুর ব্যবহারের ছবি

আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের মনোভাবে পরিবর্তন নিয়ে এল। পোষা পশুদের মধ্যে কুকুর শিকারীদের খুবই কাজে আসত, রাত্রে কুকুর পাহারাদারের কাজ করত। অন্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, মোষ ও ঘোড়া খুবই উপকারী জন্তু। এদের দুধ খাওয়া যায়; বলদ, মোষ ও ঘোড়া ভারবোঝা বহন ও লাঙল টানার কাজে লাগে। ছাগল ও ভেড়ার মাংস খেতে খুবই ভাল, ছাগলের দুধের উপকারিতা অনেক; হরিণের ও ভেড়ার চামড়ায় ভালো পোশাক হয়। এভাবে জীবজন্তুকে পোষমানানো এবং চাষের কাজে তাদের লাগানোর মধ্য দিয়ে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের বিরাট অগ্রগতি সাধিত হল।

ঠিক এর পাশাপাশি মাটির নানা রকম বাসনপত্র তৈরি করার কৌশল মানুষ শিখলেন। কুমোরের চাকের সাহায্যে মাটির পাত্র তৈরির কাজ ধীরে ধীরে শুরু হল। শন থেকে সুতো বের করে জাল বোনা এবং কাপড় বোনার প্রাথমিক কৌশল মানুষেরা শিখে নিলেন। মানুষ ধীরে ধীরে সুরক্ষিত গুহায় বাস করতে লিখলেন। তাঁরা এখন পাথরের এক ধরনের ঘরবাড়িও বানাতে শিখলেন। পাথরের থাম পুতে তার উপরে লতাপাতার ছাউনি দিয়ে তাঁরা এক ধরনের ঘর তৈরির কাজ শুরু করলেন। সবাই মিলে নিরাপদে থাকার জায়গা তাঁরা তৈরি করতে লাগলেন। পাথরের চাকা বানিয়ে মালপত্র ঠেলে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যেতে তারা শিখলেন। এই যে ঘটনাগুলোর কথা বলা হল তার প্রত্যেকটি আদিম মানুষের জীবনে নতুন যুগের সূত্রপাত করল। প্রকৃতির শক্তিকে বুদ্ধিবলে মানুষ নিজের প্রয়োজনে বেশী বেশী করে কাজে লাগাতে শুরু করলেন। একেই বলা চলে সভ্যতার পথে মানুষের প্রথম দিকের বড় বড় জয়যাত্রা। অসহায় মানুষ সমবেত চেষ্টায় অত্যন্ত প্রাথমিক আকারে হলেও নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের প্রাথমিক কাজগুলো শিখে নিতে শুরু করেছেন। আদিম

মানুষের জীবনে স্বস্তি খানিকটা এসেছে। তাঁর কল্পনার শক্তি বেড়েছে। গুহার প্রাচীরের গায়ে, পাহাড়ের পাথরে আদিম মানুষ তখন শিকারের নানা জীবজন্তুর ছবির রেখাচিত্র আঁকতে শুরু করেছেন। আদিম মানুষের কাগজ, কালি, তুলি, পেনসিল—কিছুই ছিল না। শুধু ছুঁচোলো পাথর দিয়ে আঁকা এই ছবিগুলো প্রাচীর গুহার গায়ে আজো দেখতে পাওয়া যায়। এই ছবিগুলো তাই আদিম মানুষের জীবন-সংগ্রামের ও শিল্পপ্রীতির জীবন্ত প্রমাণ।

আদিম মানুষের কাছে জীবন ও মৃত্যু খুবই রহস্যের ব্যাপার বলে মনে হত। চারদিকে যে সব জীবজন্তু ও জিনিসের প্রতি তাদের ভয় ছিল এবং যাঁদের কাছ থেকে তারা নানা সাহায্য পেতেন তাদের প্রতি এদের মনে নানা ধারণা গড়ে ওঠতে থাকে। নদীর জল না হলে মানুষ বাঁচতে পারতেন না, তাই নদীকে দেবতা জ্ঞানে তারা পূজো করতেন, উপকারী জন্তুকে দেবতা বা দেবতার বাহন বলে কল্পনা করতেন। প্রাকৃতিক নানা শক্তিকে আগুন—ঝড় ও বৃষ্টিকে দেবতা-জ্ঞানে পূজোর প্রচলন হতে থাকে। এই বিশ্বাস থেকেই অশুভ শক্তিগুলোকে যেমন সাপ ও হিংস্র বন্য পশুকে পূজো করে সন্তুষ্ট করার নানা নিয়ম চালু হয়। শুধু নিজের শক্তির উপর নির্ভর না করে অসহায় আদিম মানুষ নানা প্রাকৃতিক শক্তির ও দেবদেবীর আরাধনা শুরু করেন। এসব বিকাশ পৃথিবীর সর্বত্র সমান ভাবে হয়েছে এমন নয়। তবে সাধারণ ভাবে এসব বিশ্বাস নব্য প্রস্তর যুগে ব্যাপক ভাবে ছড়াতে থাকে। নানা কাহিনী রূপ নিতে থাকে লোকের মুখে মুখে।

দেবদেবীর কল্পনা ও ধর্মবিশ্বাসের সূচনা

এভাবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আদিম মানুষের মধ্যে দেখা দেয়। নানা ভাবভঙ্গি করে নিজের মনের কথা অন্যকে বোঝানোর মধ্য দিয়ে এক ধরনের ইঙ্গিতের ভাষা বা সাঙ্কেতিক ভাষার প্রাথমিক প্রচলন শুরু হয়। নানা রকম শব্দ ও ভাবভঙ্গির

এক একটা নির্দিষ্ট অর্থ সমাজের সকলের কাছে গৃহীত হতে থাকে। এভাবে আদিম মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভাষার প্রচলন হয়; পর পর অনেকগুলো ছবি এঁকে এঁকে মনের ভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে এক ধরনের 'ছবির ভাষা' প্রচলিত হয়। এই সময়ে নানা দেব-দেবী ও ঠাকুর-দেবতার ধারণা অনেকটা স্পষ্ট রূপ নিতে থাকে। তার মধ্যে সব-চেয়ে বেশী প্রচলিত ছিল ফসলের দেবদেবীর ধারণা। তাঁদেরকে পূজো করলে বেশী ফসল, ভালো ফসল পাওয়া যাবে এরকম ধারণা ঐ সময়ের আদিম মানুষের মনে সহজেই ঠাঁই করে নেয়। ফসলের দেবতা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জন্মদাত্রী নারীরূপে কল্পিত হয়েছেন। সন্তানের জন্ম ও ফসলের জন্মের মধ্যে আদিম মানুষ একটা সুন্দর মিল দেখতে পেয়েছিলেন।

ভাষায় ব্যবহার শুরু হল

অন্য দিকে নিজেদের বাসস্থানের কাছেই উর্বর জমিতে মাটি খুঁড়ে ফলমূলের চাষ শুরু হল। এটাকে কৃষির একেবারে শুরু বলা চলে। কৃষির হাতিয়ার হিসেবে নিড়ানির ব্যবহার খুব প্রাচীন কালেই আরম্ভ হয়।

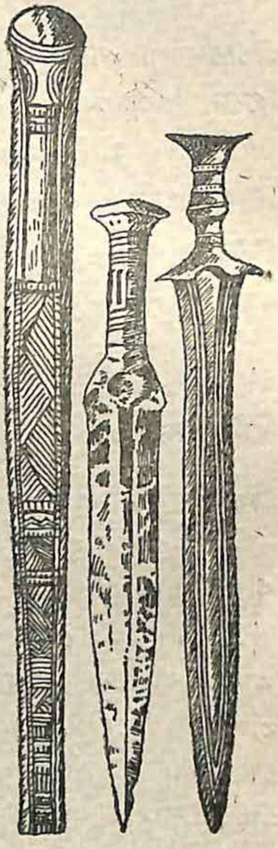
আদিম চাষের শুরু

নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের সম্বল ছিল শুধু পাথরের হাতিয়ার। ধাতুর ব্যবহার তখনও শুরু হয় নি। পাথরের হাতিয়ারের নানা অসুবিধে। তা তৈরি করা খুবই কষ্টকর। পাথর দিয়ে কাঁচি বা কাস্তে বানানো সম্ভব ছিল না। এসব অসুবিধের জন্য ধাতুর ব্যবহারের দিকে মানুষের দৃষ্টি পড়ল। মানুষের ব্যবহৃত প্রথম ধাতু হচ্ছে তামা। তামা প্রায় অবিকৃতভাবেই ভূপৃষ্ঠের তলায় পাওয়া যায়। তামার আবিষ্কার ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আদিম মানুষের সমাজে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হল। এই নূতন যুগকে বলা হয় তাম্র যুগ।

তৃতীয় অধ্যায়

তামা ও ব্রোঞ্জের যুগ

ধাতুর ব্যবহার মানুষের সমাজের বিকাশের ইতিহাসে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মানুষের ব্যবহৃত প্রথম ধাতু হচ্ছে তামা। তামা খুব সহজে পাওয়া যায় ভূপৃষ্ঠের অল্প নীচেই। তামার ব্যবহারের ফলে হাতিয়ার ও অস্ত্র তৈরি করা সহজ হল এবং মানুষের শ্রমের উৎপাদনী ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল।



ব্রোঞ্জের তৈরী তলোয়ার ও ছোরা

ধাতু হিসেবে তামা হল তুলনামূলকভাবে নরম। কালক্রমে তামার সঙ্গে টিন ও সীসা মিলিয়ে একটি নতুন ধাতু তৈরি হল—এই ধাতু হচ্ছে ব্রোঞ্জ। তামার তুলনায় ব্রোঞ্জ অনেক বেশী শক্ত ও মজবুত। ব্রোঞ্জের ব্যবহারের ফলে নানা প্রকার অস্ত্র ও জিনিসপত্র তৈরি করা সহজতর হল।

আর এই ভাবে কিছু কিছু লোক বিশেষ রকমের কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে লাগলেন। সমাজে কারিগর ও দক্ষ কর্মীদের একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হল। তাঁরা তখন এক জায়গায় বসে কাজকর্ম করতে লাগলেন এবং তাঁদের কাছে এসে অন্য লোকজনেরা প্রয়োজনীয় হাতিয়ারপাতি তৈরি করিয়ে নিতে লাগলেন। এভাবে কিছু কিছু

ঘনবসতি অঞ্চল গড়ে উঠতে লাগল এবং প্রাচীন কালের প্রাথমিক শহর এবং ব্যবসা-কেন্দ্রের পত্তন হল।

ধাতুর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কৃষিনির্ভর সমাজ ও পশু পালক সমাজগুলোর মধ্যে নানা পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। পরিবার-গুলো অনেকটা পরিষ্কার রূপ নিতে লাগল ; পরিবারের লোকসংখ্যার ভিত্তিতে এবং পরিবারে দক্ষ মানুষের সংখ্যা অনুযায়ী নানা পরিবারের আয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিতে লাগল। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কিছু পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়তি উৎপাদন করা সম্ভব হল। এই বাড়তি অংশ মজুত করে রাখা হত এবং তা বিনিময় করে প্রয়োজনীয় অন্য জিনিস সংগ্রহ করা যেত। ধাতুর ব্যবহারের ফলে বাড়তি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল।

কৃষির জন্য প্রত্যেকটি পরিবারের পৃথক জায়গা নির্দিষ্ট থাকত। পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-বুড়ো সকলে মিলেই জমিতে যথাসাধ্য কাজ করতেন। সকল আদিম শিকারী সমাজই যে একসঙ্গে শিকার ছেড়ে লাঙ্গল ধরেছিলেন তা নয়, কতগুলো সমাজ পশু-পালনকে প্রধান বৃত্তি হিসেবে বেছে নেয়। যে সব জায়গা কৃষিকার্যের উপযোগী ছিল না, যেমন—পাহাড়ের পাদদেশ, সেখানে পশুপালন বেশী হত। পশুপালকেরা অনেকটা যাযাবর জীবন যাপন করতেন। এক জায়গায় পশুর খাদ্য, যেমন—ঘাস ইত্যাদি ফুরিয়ে গেলে তাদের অন্যত্র সরে যেতে হত। কৃষির প্রসারের ফলে এই যাযাবর জীবনের শেষ হল।

পশুপালকদের দুধ, মাংস, লোম, চামড়া ইত্যাদি প্রচুর থাকলেও শাক-সবজি ও কৃষিজাত পণ্যের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিলেন না। তার জন্য অনেক পশুপালক সমাজ কিছু কিছু কৃষি-কাজও করতেন। তবে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের জন্য প্রতিবেশী সমাজের সঙ্গে বিনিময়ের ওপরই তাদের নির্ভর করতে হত।

এ ভাবে প্রাচীন কালেই বাণিজ্য ও বিনিময়ের শুরু হল। কৃষি-প্রধান সমাজ পশু-পালক সমাজগুলোর কাছ থেকে পশম, পশুর চামড়া, হাড়ের ও শিংয়ের তৈরি জিনিস এনে বিনিময়ে তাদের কৃষি-জাত জিনিসপত্র দিত। এই বিনিময় ছিল সমাজের সঙ্গে সমাজের বিনিময়—ব্যক্তিগতভাবে বিনিময় বা মুদ্রার প্রচলন তখনও শুরু হয় নি।

কৃষির জন্য নূতন জায়গা পরিষ্কার করে নানা পরিবার নিজেদের মধ্যে তা ভাগ করে নিত। তবে সকলে ভালো ও সমান উর্বর জমি পেত না। এভাবে ক্রমে বড় পরিবার, ছোট পরিবার, ধনী ও গরীব পরিবারের জন্ম হল এবং সমাজে নানা রকম ভেদ-বিভেদের সূত্রপাত হল। পশুপালক সমাজেও নানা পার্থক্য দেখা দিল। সকল পরিবারেরই একই রকম ভালো চারণ-ভূমি ছিল না। তাই দেখা গেল কোনো পরিবারের পশুর সংখ্যা বেশী এবং তারা বেশী সবল। তার ফলে এদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিনিময়ের সুযোগ বেড়ে যাওয়ায় পরিবারগুলোর মধ্যে অসমতা বেড়ে যেতে লাগল। এ ভাবে প্রাচীনকালেই ধনী ও গরীবের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য দেখা দিতে লাগল।

আদিম সমাজে ভেদ-বিভেদ শুরু হল

ধাতুর ব্যবহার এই অসমতাকে আরো বাড়িয়ে দিল। পাথর সর্বত্র পাওয়া যেত কিন্তু তামা বা অন্যান্য ধাতু সর্বত্র পাওয়া যেত না; তাই যাদের তামা আছে তাদের সমৃদ্ধিও বেশী ছিল। খৃষ্টের জন্মের প্রায় দু' হাজার বছর আগে লোহা আবিষ্কৃত হয়। লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে মানুষ এমন সব অস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি করতে পারলেন যা প্রস্তর যুগের বা তাম্র যুগের মানুষের পক্ষে একান্ত অসাধ্য ছিল। এ সবের ফলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য আরো বাড়ল, ধনী ও গরীব পরিবারের প্রভেদও বেড়ে গেল।

সমাজের এই ধনী লোকেরা তাদের সম্পদের জোরে অন্যদের কাজে লাগাতে লাগলেন। অস্ত্রের জোরে দুর্বল গোষ্ঠীগুলোকে জয় করে তাদের ভালো জমি ও সম্পদ দখল করে নিতে লাগলেন। যুদ্ধে পরাজিতদের বন্দী করে এনে ক্রীতদাসে পরিণত করতে লাগলেন। দাসদের কাজ করতে বাধ্য করে গ্রামের ধনীরা আরো ধনী হয়ে উঠতে লাগলেন। বড় বড় পরিবারগুলো ভেঙ্গে ছোট ছোট পরিবারের সৃষ্টি হল এবং এক ধরনের গ্রাম-সমাজের সৃষ্টি হল। বৃহৎ যৌথ পরিবারের স্থলে গ্রামের সৃষ্টি এক নতুন জীবনধারার জন্ম দিল।

অসমতা ও শোষণ দুই-ই এভাবে বাড়তে লাগল এই নতুন গ্রাম-গুলোতে। যে সব ধনী পরিবারের বেশী সংখ্যক দাস রয়েছে তাঁরা বেশী জমি দাবি করতে লাগলেন। আদিম সমাজের সমতা ভেঙ্গে পড়ল; শ্রেণী-বিভক্ত এক নতুন সমাজের সৃষ্টি হল। অন্যের শ্রমের ফল ভোগ করা কিছু পরিবারের পক্ষে সম্ভবপর হল।

এই যে প্রাথমিক স্তরের দাস-সমাজের সৃষ্টি হল তাতে করে গ্রামের মধ্যে এক একটি পরিবার খুবই ধনী ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। এই ক্ষমতাবান প্রধান ব্যক্তিরা অস্ত্র ও সম্পদের জোরে অনেকগুলো গ্রামের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে নিজেরা এক ধরনের রাজা ও প্রভু হয়ে উঠতে লাগলেন। নানা দেবদেবীর ও ধর্মীয় কাহিনীর প্রচার করে ঐ সব লোক নিজেদের অধিকারকে একটা স্বীকৃত রূপ দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন। এভাবে অত্যন্ত প্রাথমিক ধরনের একটা শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি হল। রাজা, রাজ্য এবং তাঁর ক্ষমতাকে মান্য করার জন্য মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মনোভাব সৃষ্টি করা হল আর তার পাশাপাশি লাঠিয়াল ও পাহারাদার এবং সৈন্য-সামন্তেরও সৃষ্টি হল। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর ইতিহাসে এই ব্যাপারগুলো অনেক স্পষ্ট আকারে দেখতে পাওয়া যাবে।

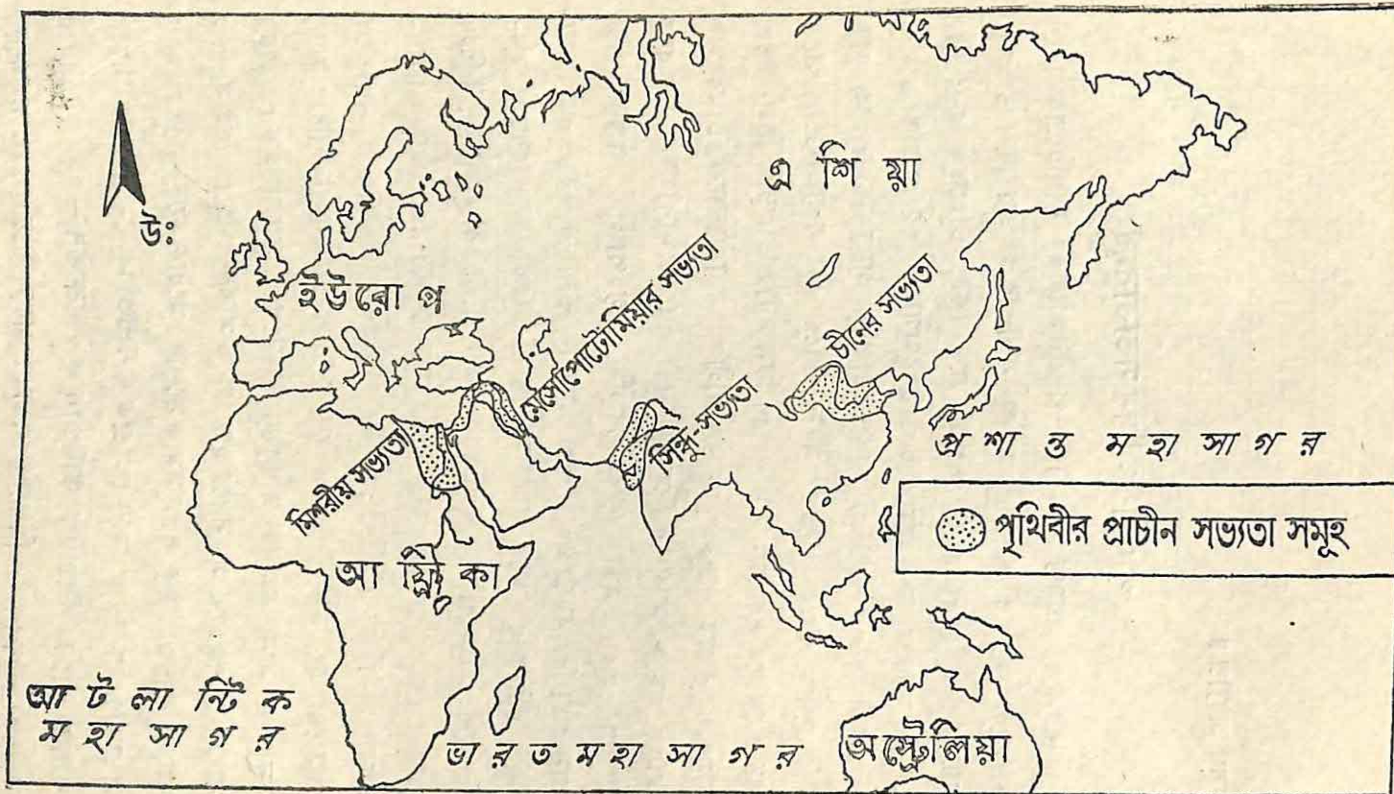
প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে যে প্রস্তর যুগ চলে এসেছে তার কথা যত দ্রুত আমরা বলে নিয়েছি তত দ্রুত তা শেষ হয়ে যায় নি। প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য দীর্ঘ সময় কেটেছে। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ পাথরের অস্ত্রপাতির উন্নতি সাধন করে বিরাট অগ্রগতি সাধন করেছিলেন। আগুনের ব্যবহার ও আগুন তৈরির কৌশল মানুষের হাতে এক বিরাট শক্তি এনে দিয়েছিল। পশু-পাখিকে পোষ মানানো এবং কৃষিকার্যের সূত্রপাত আদিম মানুষের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল। আদিম কৃষি-নির্ভর সভ্যতা-গুলো বড় বড় নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছিল। এই সমস্ত ব্যাপারই ঘটেছিল প্রস্তর যুগের সীমার মধ্যে।

তামা ও ব্রোঞ্জের মতো ধাতুর ব্যবহার আদিম মানুষের জীবনে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করল। বলা যায়, সভ্যতার পথে মানুষের এ ছিল এক বিরাট জয়যাত্রা। এই সব বিরাট বিরাট অগ্রগতির পাশাপাশি আমরা দেখেছি মানুষের সমাজে অন্য দিকে নানা ভেদ-বিভেদ দেখা দিয়েছে। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে এক ধরনের শ্রেণীগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে ছোট ছোট পরিবার সৃষ্টি হয়েছে, গ্রাম জীবনের সূত্রপাত হয়েছে, গ্রামের মুখ্য-ব্যক্তিদের সৃষ্টি হয়েছে, ধনে-জনে তাঁরা বলবান হয়ে উঠেছেন, আশে পাশের গ্রামকে দখল করে একটি গ্রামের প্রধান অনেকগুলো গ্রাম ও শহরের প্রধান ব্যক্তি বা রাজা হয়ে উঠেছেন। এ সবের পাশাপাশি ধর্ম-বিশ্বাস ও ঠাকুর-দেবতার অনুগ্রহ লাভের প্রতি তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এক ধরনের সুগঠিত শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মোটামুটি এই ঘটনাগুলোই মিশর, মেসোপোটেমিয়া, ভারতের সিন্ধু সভ্যতা ও চীন দেশের সভ্যতা এবং ঐ সময়ের পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে আমরা দেখতে পাব।

চতুর্থ অধ্যায় ॥

পৃথিবীর আদিম সভ্যতাসমূহ

এইসঙ্গে প্রদত্ত পৃথিবীর প্রাচীনকালের মানচিত্রের দিকে তাকালে যে সব অঞ্চলে আদিম সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল তা দেখা যাবে। তার মধ্যে মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারতের এবং চীন দেশের সভ্যতার কাহিনী খুবই উল্লেখযোগ্য। এই সভ্যতাগুলোর একটি সাধারণ মিল হচ্ছে এই সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছে বড় বড় নদীগুলোর তীরে তীরে। নদীর তীরে এই সভ্যতাগুলো গড়ে ওঠার পেছনে সব চেয়ে বড় কারণ ছিল নদীর তীরভূমি ছিল উর্বর, চাষবাস করার পক্ষে খুবই উপযোগী। নদীর জলকে চাষবাসের কাজে সহজে লাগানো যেত। নদী থেকে নানারকম মাছ ধরে খাওয়া যেত। নদী-তীরের তৃণভূমিতে গৃহপালিত পশুর খাদ্য ঘাস ইত্যাদি সহজেই পাওয়া যেত। তাছাড়া বড় বড় নদী দিয়ে নৌকোয় করে মালপত্র আনা-নেওয়া করা যেত, দেশ-বিদেশের মধ্যে বাণিজ্য করা সহজ হত। পণ্ডিতেরা বলেছেন, দক্ষিণ ভারত থেকে সেগুন কাঠ নিয়ে মেসোপোটেমিয়ার রাজপ্রাসাদগুলো নির্মিত হয়েছিল; এই কাঠ নিশ্চয়ই জল ও নদীপথে পাঠানো হয়েছিল। ভারত থেকে এ সময়ে সোনা, হাতীর দাঁত, ময়ূর ও নানা ধরনের মণিমুক্তা বিদেশে পাঠানো হত। প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য যে ঐ সময়ে হত তাতে সন্দেহ নেই। এই ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু সভ্য সমাজগুলোর মধ্যেই হতে পারে। এই সভ্যতাগুলো ছিল নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতা। মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস—এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। মিশরের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নীল নদের



উঃ
ইউরোপ
এশিয়া
মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতা
চীনের সভ্যতা
সিন্ধু-সভ্যতা
মিশরীয় সভ্যতা
আফ্রিকা
প্রশান্ত মহাসাগর
পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা সমূহ
আটলান্টিক মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
অস্ট্রেলিয়া

তীরে ও উর্বর ব-দ্বীপ অঞ্চলে। ভারতের আদিম সভ্যতা গড়ে উঠে সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর তীরে তীরে আর চীনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল হোয়াং হো ও ইয়াংসি নদীর উর্বর তীরভূমিতে।

মোটামুটিভাবে ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত এই সভ্যতাগুলো বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তার পর তার জায়গায় নূতন নূতন সভ্যতার উদয় হয়। আফ্রিকা ও এশিয়াতে ব্রোঞ্জ ধাতুর প্রচলন ইউরোপের অনেক আগে শুরু হয়েছিল এবং ঐ সব অঞ্চলে অনেক আগে তাই উন্নত সভ্যতার পত্তন হয়েছিল।

এক ॥ মেসোপোটেমিয়া-র প্রাচীন সভ্যতা



তাইগ্রীস আর ইউফ্রেতিস নদী দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় মেসোপোটেমিয়া। সুজলা, সুফলা এই অঞ্চলকে গ্রীকরা

বলতেন 'মেসোপোটেমিয়া' অর্থাৎ "দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ"। একেবারে সার্থক নাম। আর্মেনিয়ান পর্বত থেকে নির্গত এই নদী দুটি পশ্চিম এশিয়ার এই মরুভূমির মত অঞ্চলকে পলিমাটিতে উর্বর ও কৃষিকার্যের অত্যন্ত উপযোগী করে তুলেছিল। আধুনিক কালের সিরিয়া ও ইরাক দেশের মধ্যে এই অঞ্চলটি পড়েছে। মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এই উর্বর অঞ্চল অত্যন্ত প্রাচীন কাল থেকেই চারদিকের সমস্ত যাযাবর মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। প্রাচীন কালের সকল যাযাবর আর আশ্রয়-সন্ধানী লোকেরা দলে দলে এসেছেন এই শস্য-শ্যামল অঞ্চলকে দখল করে নিতে ; কারণ অনেক সহজেই এখানে প্রচুর শস্য ফলানো যেত। স্বভাবতই মেসোপোটেমিয়ার এই অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকেই নানা গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে একমাত্র সবচেয়ে শক্তিমান ও উন্নত গোষ্ঠীর পক্ষেই ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয়েছিল। আর এই-ভাবে মেসোপোটেমিয়ায় প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ একটি সভ্যতারই সৃষ্টি হয়েছিল। নদীর প্লাবনে স্বাভাবিক সেচের কাজ হত ; জলবায়ু ছিল উষ্ণ ; ভূমি উর্বর ; তাই সহজেই চাষবাস করা যেত। এই সব সহায়ক কারণের জন্যই পৃথিবীর আদিমতম সভ্যতা এখানে গড়ে উঠেছিল বলে অনেকে মনে করেন।

তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস নদী দুটি যেখানে এসে মিলিত হয়েছে প্রাচীনকালে ঐ অঞ্চলের নাম ছিল সেন্নার। খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সেন্নারের সমুদ্র অঞ্চলে সুমের জাতি বাস করতেন। উত্তর অঞ্চলে বাস করতেন পশুপালক আক্কাডিয়ান নামক যাযাবর সম্প্রদায়ের লোকজনেরা। এরা আরব দেশ থেকে সেন্নারে আসেন। এদের প্রধান শহর ছিল আক্কাডা।

মেসোপোটেমিয়ার সেন্নার অঞ্চল ছিল খুবই উর্বর এবং পলিমাটিতে গড়া। কিন্তু কিছু কিছু জায়গা ছিল নীচু জলাভূমি।

জমি উর্বর হলেও নদীর প্লাবনে কৃষির অসুবিধা হত। সেন্নারের অধিবাসীরা বাঁধ তৈরী করে বন্যার জল ঠেকাতেন; অন্যদিকে গ্রীষ্ম ও খরার সময় যখন জলের অভাব হত তখন বাঁধ দিয়ে আটকানো এই জল দিয়ে কৃষিকাজ হত; জলের কোন অভাব হতনা। সেন্নারের অধিবাসী সুমেরগণ ও আক্কাডিয়ানরা প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উঁচু মাটির স্তূপের উপর শহর, গ্রাম ও মন্দির গড়তেন এবং খাল কেটে জল সরবরাহ করতেন। সেন্নারের জমিতে বছরে দুবার ফসল হত। বার্লি ও গমই ছিল প্রধান ফসল। কৃষিকার্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় পশুপালনের প্রতি সুমেরীয়রা বিশেষ যত্ন নিতেন। তারা গরু, বলদ ও ঘোড়া পালন করতেন।

কৃষিকাজ ছাড়া বন্যা প্রতিরোধের জন্য বাঁধ-নির্মাণ, খাল খনন করা, ঘর বাড়ী তৈরী করা, তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্রপাতি, ছুরি, সূঁচ, ক্ষুর প্রভৃতি নানাবিধ জিনিসপত্র তৈরী করা, জন্তুর দ্বারা টানা গাড়ী তৈরী করা এবং মাটির নানা রকমের পাত্র তৈরী করা এই সবই ছিল সুমেরদের প্রধান জীবিকা। চাকা দিয়ে চালানো রথের মতো গাড়ী যুদ্ধ ও বাণিজ্যের সময় খুবই কাজে লাগত। ধাতুর ব্যবহার ছিল খুবই কম; সাধারণ মানুষ মাটির বাসনপত্রই ব্যবহার করতেন। মাটির বাসন তৈরী করার জন্য চাকার ব্যবহার শুরু হবার পর মাটির বাসনপত্র তৈরী একটা পেশা হিসাবে দেখা দিল। পাথরের বাসনপত্র তৈরী করাও ঐ সময়ে একটা পেশা হিসাবে দেখা দেয়। পাথরের তৈরী জিনিসের উপর খোদাই-করা দেব-দেবীর মূর্তি ও গোলাকার সীলমোহর প্রভৃতি থেকে বোঝা যায় ধাতুর ব্যবহার তখন বেশ ব্যাপক হয়ে উঠেছে। তামা গলিয়ে কিভাবে তাকে ছাঁচে ঢালতে হয় এই কৌশল আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন হাতিয়ারের দ্রুত উন্নতি হয়। পাথর খোদাই ও কাঠ কাটা অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

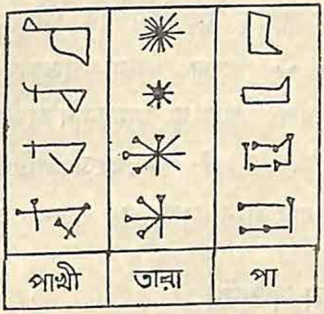
এভাবে সুমেরীয়দের সভ্যতা এক উন্নত পর্যায়ে উপনীত হয়। চাষবাসের ও পশুপালনের কাজে তারা বিশেষ উন্নতিলাভ করেন। মাটির বাসন তৈরী এবং তামা ও ব্রোঞ্জের নানা জিনিসপত্র তৈরী করার কাজেও তারা বিরাট অগ্রগতি সাধন করেন। কী করে সময়ের হিসাব রাখতে হয় তা তারা আবিষ্কার করেন এবং আজ আমরা সময়কে যেভাবে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডে ষাট দিয়ে ভাগ করি সেটা সুমেরীয়দেরই আবিষ্কার। তারা এক ধরনের লিখিত ভাষার প্রচলন করেন এবং হিসাব রাখার জন্য সংখ্যার ব্যবহার শুরু করেন।

সুমেরীয়রা নানা দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতেন এবং দেবতাদের নানা মন্দির নির্মাণ করতেন। সুমেরীয়রা উঁচু মাটির স্তূপের উপর মন্দির ও বাড়ীঘর নির্মাণ করতেন। মিশরের পিরামিডের মতো উঁচু স্তূপের উপর মন্দির নির্মিত হত এবং সবার উপরে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যায় এই রকম মিনারের মতো উঁচু টাওয়ার নির্মিত হত। তার মধ্যে 'বেবেল-এর টাওয়ার' ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

সুমেরীয়দের বিরাট বিরাট প্রাসাদ ও মন্দিরগুলো মাটির তৈরী পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত হত। মিশরের মতো বড় বড় পাথর দিয়ে ওগুলো নির্মিত হয় নি। মেসোপোটেমিয়ায় এ ধরনের পাথর পাওয়া যেত না; তাই সুমেরীয়রা মাটির তৈরী ইট পুড়িয়ে প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করতেন। ইটের গায়ে নানা রকম চিত্র এবং পাথরের গায়ে খোদাই করা নানা দেবদেবী ও পশু পাখীর চিত্র অংকিত হত। তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার খুবই প্রচলিত ছিল। তামা গলিয়ে তার সঙ্গে সীসা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরী করা হত। ব্রোঞ্জ অনেক শক্ত; তাই অস্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র অনেক মজবুত হত।

সুমেরীয়দের মধ্যে ছবি এঁকে এঁকে মনের ভাব বোঝাবার জন্য লিখিত ভাষা প্রচলিত হয়। সুমেরীয়রা কাগজের ব্যবহার

জানতেন না ; তাই মাটির ওপর দাগ কেটে ছবি এঁকে তারা ভাষার ব্যবহার শুরু করেন। শক্ত মাটির ওপর ছবি আঁকা কঠিন কিন্তু নরম মাটির গায়ে ধারালো হাতিয়ার দিয়ে দাগ টানা সহজ। তাই সুমেরীয়দের ভাষা ছিল অনেকটা রেখাচিত্র ও টানা দাগের মতো। নরম মাটির প্লেটে রেখা ও দাগ টেনে শুকিয়ে পুড়িয়ে নিলে লেখাগুলো পাকা হয়ে যেত। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে পুরাতত্ত্ববিদেরা অনেক পোড়ামাটির এ ধরনের নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন ; তা থেকে সুমেরীয়দের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা গেছে।



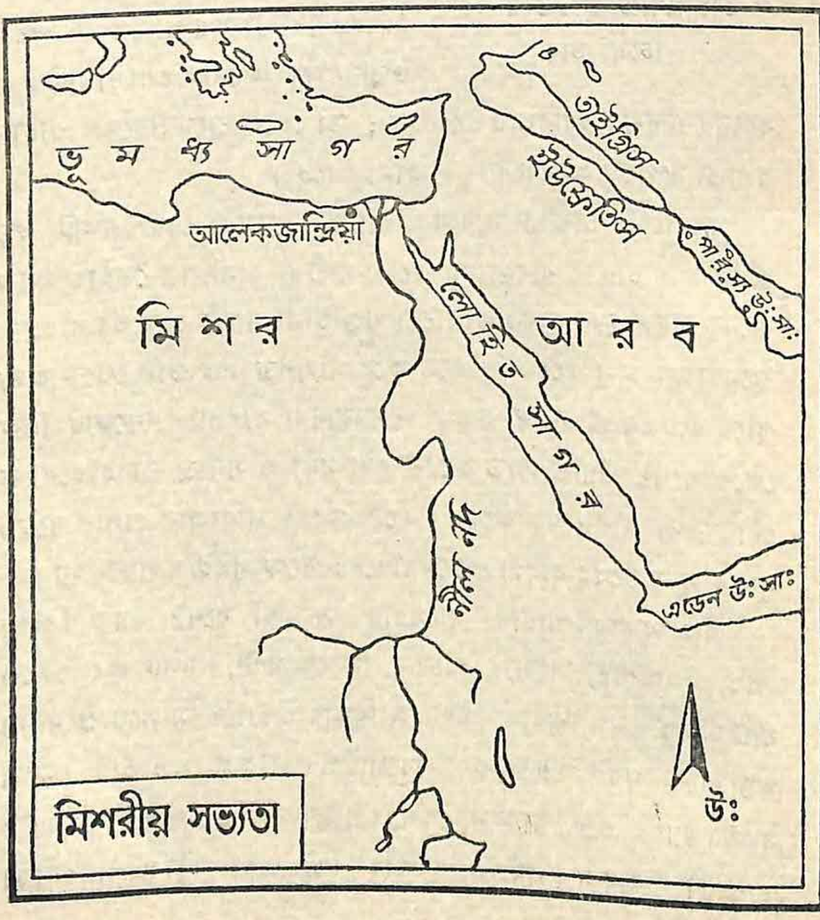
মেসোপোটেমিয়ার রেখা-চিত্রের ভাষা

কুমোরের চাকার ব্যবহার প্রাচীন সুমেরীয়দের একটি বড় কীর্তি। ঐ চাকার ব্যবহারের ফলে মাটির বাসনপত্র তৈরীর কাজ অনেক সহজ হয়। চাকা-লাগানো পশু-টানা গাড়ী ও রথের ব্যবহার সুমেরীয়রা চালু করেন। এতে করে মালপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বয়ে নেওয়া সহজ হত। সুমেরীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন এবং নদী ও সমুদ্রে ব্যবহারযোগ্য নৌকার ব্যবহারও শুরু করেন। এতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। যুদ্ধের সময় রথের ব্যবহার সুমেরীয়দের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়।

এক কথায় প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত ছিল। ভাষার ব্যবহার, সংখ্যার প্রচলন, দিনকে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডে ষাট ভাগে ভাগ করার নিয়ম আবিষ্কার ইত্যাদি মিলিয়ে সুমেরীয় সভ্যতাকে খুবই উন্নত করে তুলেছিল। কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে যতই উন্নতি হয়ে থাক না কেন, ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রীস নদীর তীরবর্তী অঞ্চল সমতল হওয়ার জন্য এবং নদীগুলো নৌকা

চালানোর উপযোগী ছিল বলে বিদেশীদের আক্রমণের বিপদ বারে বারে সুমেরীয়দের অস্থির করে তুলত। বাইরের আক্রমণ এবং প্রাকৃতিক বন্যা ও বিপর্যয় আদিম সুমেরীয় সভ্যতার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খৃষ্ট পূর্ব ২৫০০ অব্দে আক্কাডিয়ানরা সুমেরদের পরাজিত করে এবং তারপর অন্যান্য আক্রমণকারীরা দলে দলে এসে মেসোপোটেমিয়াকে একটি রণক্ষেত্রে পরিণত করে। এভাবে নানা রাজ্য গড়ে ওঠে এবং নানা সভ্যতার পত্তন হয়।

দুই ॥ মিশরের প্রাচীন সভ্যতা



মিশরীয় সভ্যতা

মিশরকে বলা হত 'নীলনদের দান'। নীলনদের দুই তীরবর্তী অঞ্চলকেই বলা হয় মিশর দেশ। মিশরের পূর্ব ও পশ্চিমে সুবিস্তীর্ণ পর্বতমালা। পশ্চিমের পর্বতের অপর দিকে সাহারা মরুভূমি। মিশরে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে; হঠাৎ বৃষ্টি হলে মিশরবাসীরা তাকে অশুভ বলে মনে করতেন। বছরে একবার নীলনদের প্লাবন হয়। এই প্লাবন না হলে মিশর দেশ শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমিতে পরিণত হত। প্লাবনের সময় চারদিক জলে ভরে যেত। গ্রামগুলিকে তখন জলে-ঘেরা দ্বীপের মতো মনে হত। এই প্লাবন প্রায় চার মাস স্থায়ী হত। বন্যায় জমিতে পলি পড়ে; এর ফলে মিশরের জমি খুবই উর্বর। চাষ করা খুবই সহজ ছিল কেননা বন্যার পর মাটি নরম থাকে। কৃষিই মিশরবাসীর প্রধান অবলম্বন। প্রাচীনকালে মিশরে গম, বালি ও শনের চাষ হত। মিশরের অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকা এভাবে নীলনদের প্লাবনের উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল বলে মিশরকে 'নীল নদের দান' বলা হয়। নীলনদের পলিমাটিতে এক হাজার মাইল দীর্ঘ যে ব-দ্বীপ গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে মিশরের সব চেয়ে উর্বর ও ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। মিশর তাই প্রকৃতপক্ষেই 'নীলনদের দান'।

মিশরে কৃষিকাজ সহজ ছিল; জমি ছিল উর্বর। তাই অতি প্রাচীন কাল থেকেই নীলনদের তীরবর্তী ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে পৃথিবীর সুপ্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। নদীতীরে কৃষিকাজের ও জীবন-যাপনের সুবিধার জন্যই প্রাচীন সভ্যতাগুলো নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছিল। পূর্বে লোহিত সাগর, উত্তরে ভূমধ্য সাগর এবং দুই পাশে উচ্চ পর্বতের প্রাচীর ও পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি থাকায় মিশরীয়দের স্বাভাবিক নিরাপত্তার একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। শুধু উত্তর দিকে সংকীর্ণ সমতল ভূমি ও নীলনদের ব-দ্বীপ দিয়ে

মিশর মেসোপোটেমিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। নীলনদের মাঝে মাঝে স্রোত খুবই বেশী বলে তা নৌ-চালনার উপযোগী নয়। এ সব কারণের জন্য মিশর দেশের ওপর মেসোপোটেমিয়ার মতো ঘনঘন বিদেশী আক্রমণ সহজ ছিল না।

বাইরের আক্রমণ থেকে মোটামুটি ভাবে মুক্ত হয়ে এবং উর্বর কৃষিক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে অতি প্রাচীন কালেই মিশরে একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশর দেশ চল্লিশটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। একটা মজার ব্যাপার ছিল এই যে ঐ অঞ্চলগুলোর নাম ছিল এক একটা পশুর নামে। পশুর নাম অনুযায়ী এই যে নানা অঞ্চলের নাম করার নিয়ম তাকে বলে 'টোটেম প্রথা'। ঐ সব অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে ঐ পশুগণ অত্যন্ত পবিত্র ও সৌভাগ্যের প্রতীক বলে বিবেচিত হত। এটা ছিল এক প্রাচীন প্রথা। টোটেম প্রথা সাধারণ ভাবে শিকারী সমাজেই দেখা যায়। মিশরের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐ সব প্রাচীন নাম থেকে বোঝা যায় মিশরীয়রা শিকারী-সমাজ থেকে কৃষিনির্ভর সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছেন। নীলনদের বন্যা এবং তা থেকে যে পলি পড়ত তাতে মিশরীয়দের পক্ষে কৃষি-কার্য করা অনেক সহজ হয়ে উঠেছিল। নীলনদকে প্রাচীন কালে দেবতা জ্ঞানে পূজো করা হত। প্রাচীন কালের মানুষ তাদের খাদ্য ও পানীয়ের জন্য নীলনদের উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন—এই হচ্ছে তার কারণ। কালক্রমে খৃষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মিশরের বিভিন্ন অঞ্চল একত্রিত হয়ে একটি বিরাট রাজ্যে পরিণত হয়। প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় ৩৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মিশরে মেনেস নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। রাজা মেনেস ছিলেন হেমাইট বংশের লোক। হেমাইট বংশের লোকেরা তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরে মেসোপোটেমিয়ায় বাস করতেন। জীবিকার সন্ধানে হেমাইটরা মিশরে আসেন এবং

মিশরের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মিলেমিশে একটি জাতিতে পরিণত হন।

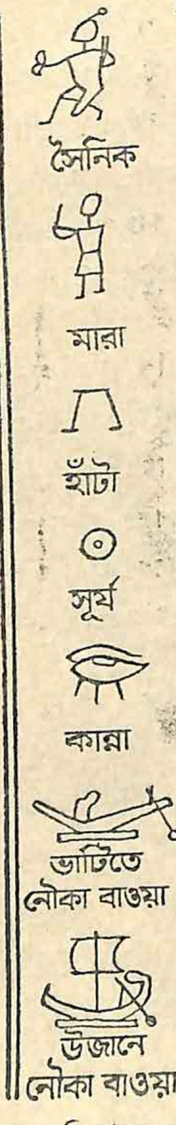
নীল নদের জল ছাড়া মিশরদেশ মরুভূমি হয়ে পড়ত। নীল নদের বন্যার ফলে মাটি ছিল যেমন উর্বর, কৃষিকার্য তেমনি ছিল লাভজনক ও সহজসাধ্য। আবহাওয়া গরম থাকার ফলে পোষাক পরিচ্ছদের প্রয়োজন কম ছিল এবং ঝড়-বৃষ্টি হয় না বলে ঘরবাড়ী ছিল অত্যন্ত হালকা ধরনের ও অল্প খরচেই সেগুলো তৈরী করা যেত। জীবন-জীবিকা সহজসাধ্য ছিল বলে মিশরে পৃথিবীর প্রাচীনতম একটি সভ্যতা গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল।

অন্যান্য সমাজের মতোই তাম্রযুগে মিশরীয়রা শিকার করে, মাছ ধরে এবং প্রধানতঃ চাষবাস করেই নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। মিশরের প্রাচীন সমাজের প্রধান ছিলেন রাজা, তার পর ছিলেন সামন্ত জমিদারগণ এবং মন্দিরের পুরোহিতগণ। মিশরের রাজাকে বলা হত 'ফারাও' (Pharaoh); প্রধান হিসাবে ফারাওকে জমিদার ও পুরোহিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে চলতে হত। এই তিনটি সামাজিক শক্তি নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে দেশ শাসন করত। সমাজে পুরোহিতদের প্রচুর প্রভাব ছিল এবং কৃষি-কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় নক্ষত্র-বিদ্যা, আবহ-বিদ্যা ও ঋতুপরি-বর্তন বিষয়ক হিসাব নিকাশের জন্য সাধারণ মানুষ পুরোহিতদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। প্রধানতঃ ধর্মীয় ব্যাপার ও হিসাবপত্র রাখার প্রয়োজন থেকেই মিশরে এক চিত্র-নির্ভর লিখিত ভাষার প্রচলন হয়। যারা এই ভাষাকে লিপিবদ্ধ করতেন তাদের



প্রাচীন মিশরের লিপিকার

বলা হত লিপিকার (Scribe)। প্রতিটি ভাব প্রকাশের জন্য এক একটি চিত্র ব্যবহৃত হত। এরকম হাজার হাজার চিত্র মুখস্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। তাই লিপিকারগণ সমাজে বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। ভাষাকে লিপিবদ্ধ করার একটি উপায় প্রাচীন মিশরে প্রবর্তিত হয়েছিল। পুরো ছবিটি না এঁকে ছবির বিশেষ দিকগুলো চিত্রিত হত। এটাকে এক ধরনের সাংকেতিক ভাষা বলা চলে। যেমন ঘর বোঝাবার জন্য পুরো ঘরের ছবি না এঁকে চারটি খুটির মতো চারটি উর্ধমুখী সরলরেখা এঁকে ঘর বোঝানো হত। সব কিছু মিলিয়ে মিশরীয় ভাষা এভাবে ধীর গতিতে উন্নতি লাভ করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে মিশরে উচ্চারণ-ভিত্তিক ভাষার প্রচলন হয়। পেপিরাস নামক গাছ থেকে কাগজের মতো পাতলা পাত তৈরী করা হত এবং তাতে লেখা হত। এই 'পেপিরাস' থেকেই কাগজ বোঝাতে ইংরেজী 'পেপার' কথাটি এসেছে।



প্রাচীন মিশরের ছবির — ভাষা (HIEROGLYPHS)

সমাজের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন কর-সংগ্রহকারী রাজকর্মচারীরা। এদের কাজ ছিল কর সংগ্রহ করা, উৎপন্ন ফসল ও অন্যান্য জিনিসপত্রের একটা অংশ কর হিসাবে রাজকোষের জন্য সংগ্রহ করা। এই কাজের জন্য সংখ্যা সম্পর্কে জ্ঞান এবং প্রাথমিক যোগ-বিয়োগ, গুণ ও ভাগের মতো গাণিতিক হিসাব সম্পর্কে জ্ঞান ছিল একান্ত আবশ্যক।

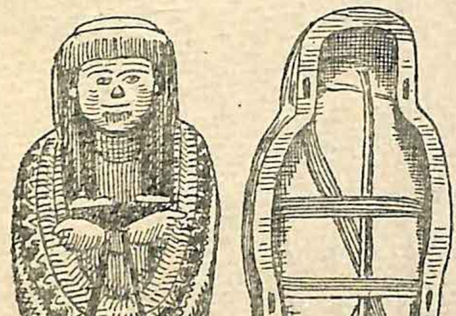
কিন্তু প্রাচীন মিশরীয় সমাজের প্রধান শ্রমজীবী অংশ ছিলেন কৃষিজীবীরা এবং 'সৈনিক' বলে পরিচিত লোকেরা। কৃষিজীবীরা চাষবাসের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, খাল কেটে কৃষিক্ষেত্রে জল নিয়ে আসা, বীজ সংরক্ষণ, ফসল কাটা ও সংগ্রহ করা ছিল এদের প্রধান কাজ। সৈনিকদের কাজ ছিল যুদ্ধ করা এবং যখন যুদ্ধ চলছে না তখন শ্রমিক হিসাবে সকল নির্মাণকার্যে দলবদ্ধ হয়ে অংশগ্রহণ করা। মিশরের এই শ্রমজীবী মানুষের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে মিশরের বিখ্যাত পিরামিড, রাজ-প্রাসাদ এবং অন্যান্য সৌধসমূহ। বিরাট বিরাট পাথরের খণ্ড গুলো যেভাবে ঐ সময়ে এত উঁচুতে তোলা হয়েছিল তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। ঐ পাথর গুলোকে সমান করতে, তার মধ্যে নানা চিত্র আঁকতে, পাথর কেটে বিরাট বিরাট মূর্তি বানাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের বহু বছরের শ্রমের প্রয়োজন হত। প্রাচীন মিশরের অজস্র পিরামিড ও স্ফিংকস নির্মাণ এবং বিরাট বিরাট প্রাসাদ ও মূর্তি নির্মাণের মধ্যে এই শ্রমজীবী মানুষের কীর্তির স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে।



প্রাচীন মিশরের হস্ত-শিল্পী কাঠমিস্ত্রী, পাথর খোদাইকারী ও বস্ত্র বয়নকারীরা

এই ছিল মোটামুটিভাবে প্রাচীন মিশরীয় সমাজের চিত্র। মানুষের মনের নানা প্রশ্ন, প্রকৃতির নানা ব্যাপার সম্পর্কে যে সব জিজ্ঞাসা দেখা দিত পুরোহিতগণ তার উত্তর দেবার চেষ্টা করতেন এবং জ্ঞানী লোক হিসাবে এরা সকলের সম্মান পেতেন। এই

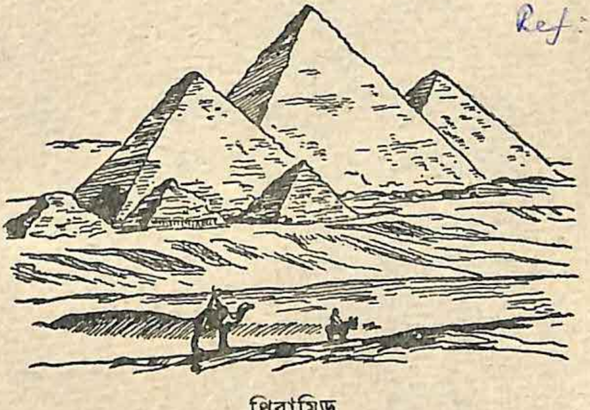
জ্ঞানী ব্যক্তিদের ওপরই দেবদেবীর পূজা-অর্চনার ভার থাকত, ঘটনার বিবরণ লিখে রাখার ভার থাকত এবং মৃত্যুর পর 'আত্মার' মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা করার দায়িত্ব থাকত। পুরোহিতরা বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন। পুরোহিত ও রাজারা ছিলেন সাধারণতঃ একই বংশের লোক। রাজা ও পুরোহিতদের এই বংশগত অভিন্নতা প্রাচীন মিশরীয় সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য।



মিশরের মমি ও মমির কফিনের ঢাকনা

এখানে প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাসের কথা একটু মনে রাখা ভাল। মিশরীয়রা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন। মৃত্যুর পর মানুষের 'আত্মা' বেঁচে থাকে এটা তারা বিশ্বাস করতেন। মৃত্যুর পর মৃতদেহ পুড়িয়ে বা মাটিতে পুতে না ফেলে শুকিয়ে মন্দিরের গুহায় রেখে দেওয়া হত এবং মৃতদেহের পাশে তার জন্য ব্যবহারযোগ্য নানা জিনিসপত্র রাখা হত। পরে মৃতদেহ সংরক্ষণের নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। মৃত্যুর পর মৃতদেহকে জারক রসে চুবিয়ে রাখা হত তারপর তাতে আলকাতারার মতো জিনিস লেপে দেওয়া হত। আলকাতারাকে পারসি ভাষায় বলে 'মুমিয়াই', তা থেকে 'মমি' কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। জারকরসে চুবানো আলকাতারা-মাখা মমি কে দীর্ঘ এক ধরনের কাপড় দিয়ে ভালো

করে জড়িয়ে রাখা হত একটি 'কফিনের' মধ্যে। মমির জন্য তার সঙ্গে নিত্য-ব্যবহার্য সকল জিনিসপত্র, খাবার, আসবাবপত্র, অলঙ্কার, অস্ত্রপাতি, নৌকা, নাপিত, ধোপা, রুটি প্রস্তুতকারী লোকজনের মূর্তি ইত্যাদি সব রাখা হত যাতে মৃত ব্যক্তির 'আত্মার' কোনো কিছুর অভাব না হয়! এই পদ্ধতি খুবই ব্যয়সাধ্য এবং রাজা, পুরোহিত ও জমিদারদের বেলায়ই এ ধরনের ব্যবস্থা করা যেত। আসলে মিশরের, পিরামিডগুলো হচ্ছে রাজা ও রাণীদের সমাধি-গৃহ। ভারতের 'তাজমহল' যেমন মোগল-সম্রাট শাহজাহান ও বেগম মমতাজের কবর-গৃহ মিশরের পিরামিড



পিরামিড

গুলো ঠিক এই ধরনেরই কবর-গৃহ। পিরামিড কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ হচ্ছে 'উঁচুতে অবস্থিত ঘর'। পিরামিড গুলো আকারে বিরাট। খৃষ্টানদের সব চেয়ে বড় গির্জা সেন্টপিটারের গির্জার তিন গুণ বড়ো হচ্ছে চিওপস্-এর বিখ্যাত পিরামিডটি। দূর দূরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক নীলনদের ওপর পার থেকে পাথর এনে এই সব বিরাট পিরামিডগুলো গড়েছেন। হাজার হাজার টন ওজনের এই সাজানো পাথর গুলো এমন সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে হাজার হাজার বছর পরেও পিরামিড গুলোর গঠন প্রায় অবিকৃত রয়েছে। প্রাচীন মিশরীয়দের গৃহ-

নির্মাণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্মকুশলতার তা এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর সব চেয়ে আশ্চর্যজনক নির্মাণকার্য হিসাবে পিরামিড গুলো সুপরিচিত। পাহাড়-প্রমাণ পাথর কেটে যে স্ফিংকস-এর মূর্তিগুলো নির্মিত হয়েছিল তাও এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। অনেক স্ফিংকস-এর মুখ হচ্ছে একজন নারীর, দেহটি সিংহের এবং মূর্তির মুখে হাসির রেখা। কেন যে এই রহস্যময় হাসি তা বোঝা যায় না। যে হাসির রহস্য বোঝা যায় না তাকে আজো বলা হয় 'স্ফিংকসের হাসি'।



স্ফিংকস

মিশরীয় সমাজে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। নানা মাটির পাত্রে ও পাথরের গায়ে পালতোলা নৌকার ছবি দেখা যায়। নৌ-বাণিজ্যের প্রচলনের তা স্পষ্ট প্রমাণ। নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান ও বিনিময় ব্যাপকভাবে মিশরে প্রচলিত ছিল। তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্রপাতি ও কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় লাঙলের ফাল, কাস্তে, নিড়ানি প্রভৃতির বিনিময়ে কৃষিপণ্যের আদান প্রদান হত।

নিগ্রোদের দেশ থেকে মিশরীয়রা কাঠ সংগ্রহ করতেন। নিগ্রোদের দেশে মিশরীয়রা সোনার সন্ধান পান। তাই ঐ দেশকে তারা 'নুবিয়া' অর্থাৎ 'সোনার দেশ' আখ্যা দেন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মিশরের সঙ্গে মেসোপোটেমিয়ার ও গ্রীসের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল।

প্রাচীন মিশরের ধর্মবিশ্বাসের প্রধান দিক ছিল নানা দেবদেবীর পূজা। মৃত্যুর পর 'আত্মা'-র বেঁচে থাকার ব্যাপারে সাধারণের বিশ্বাস ছিল প্রবল। রাজা, পুরোহিত ও সামন্ত প্রভুদের জন্য সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম করতে হত। মাঝে মাঝে কৃষকরা বিদ্রোহ করতেন। তাদের বিদ্রোহী মনোভাবকে শান্ত করার জন্য নানা দেবদেবীর কথা এবং মৃত্যুর পর আত্মার শান্তি হবে এই বিশ্বাসের কথা পুরোহিতরা বলতেন। ধর্মবিশ্বাস প্রাচীন মিশরের সমাজকে একত্রিত রাখতে সাহায্য করেছিল। বহু দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস থাকলেও দেবদেবীদের মধ্যে কে বড় তা নিয়ে পুরোহিতদের নিজেদের মধ্যে নানা বিবাদ দেখা দিত। রাজারা পুরোহিতদের মধ্যেকার এই বিরোধের সুযোগ নিতেন। তবে রাজারা পুরোহিতদের উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন। রাজারা নিজেদেরকে দেবদেবীদের



প্রাচীন মিশরীয় দেবী আইসিস

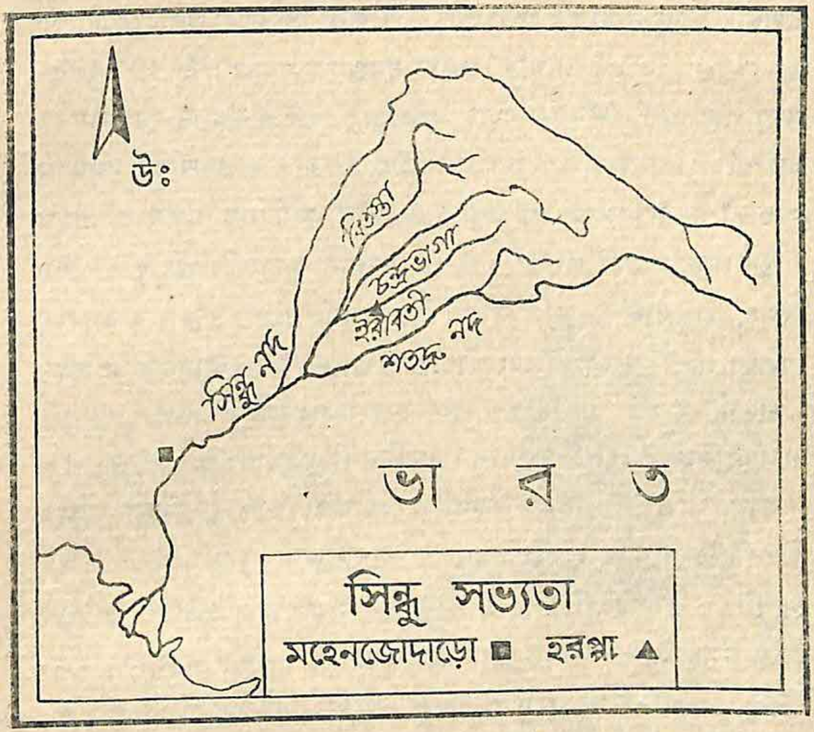


প্রাচীন মিশরীয় দেবতা অসিরিস

প্রতিনিধি বলে দাবী করতেন এবং পুরোহিতগণ মানুষের মনে এ ব্যাপারে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে সাহায্য করতেন।

সাধারণভাবে সমাজের বিভাগগুলো প্রাচীনকালের মিশরে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজা ফারাও ছিলেন সবার ওপরে; তার পাশেই ছিলেন পুরোহিতগণ ও জমিদারবর্গ; তারপর ছিলেন লিপিকারগণ অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীরা এবং এদের মধ্য থেকে আসতেন প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীবৃন্দ, বিচারক ও কর-সংগ্রহকারীরা। এরা সকলেই ছিলেন পরশ্রমজীবী। অন্যদিকে ছিলেন কৃষিজীবীরা, সৈনিক তথা শ্রমজীবীরা, হস্তশিল্পী ও কুম্ভকার এবং কর্মকারগণ যারা নানাবিধ ধাতুর জিনিসপত্র বানাতেন। এরা সকলেই ছিলেন শ্রমজীবী। ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিরা আসলে ছিলেন এক ধরনের নিয়োজিত কর্মচারী; রাজা, পুরোহিত ও জমিদারদের হয়ে এরা ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। তারা সৈন্যদের প্রহরাধীনে পাহাড়িয়া ও তৃণভূমির লোকজনদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। বাণিজ্য থেকে যা পাওয়া যেত তার একটা ভাগ তারা ও সৈনিকরা পেতেন। এই নূতন অর্জিত ধন থেকে ব্যবসায়ী ও সৈনিকদের একটা অংশ রাজা ও পুরোহিতদের মোটা টাকা দক্ষিণা দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা ক্রয় করতেন। মোটামুটিভাবে এই ছিল প্রাচীন মিশরের সমাজের বিভিন্ন ভাগ বিভাগ। কিন্তু সমাজের নীচের তলার পরিশ্রমের কাজ করতে হত দাসশ্রমিক ও ভূমিদাসদের। এদের শ্রমের মধ্য দিয়েই প্রাচীন মিশরের বিস্ময়কর বিরাট বিরাট সৌধগুলো নির্মিত হয়েছিল। অন্যদিকে সমাজের উচ্চমঞ্চের বিদ্বান ও পুরোহিতদের জ্ঞান-চর্চার মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নানা উন্নতি সাধিত হয়েছিল। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্য এবং জল সম্পর্কিত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও ধাতু এবং কৃষিবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাচীন মিশরীয়দের অবদান পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

তিন ॥ প্রাচীন ভারতের সিন্ধু সভ্যতা



ভারতের আদিম যুগের সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা গেছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে সিন্ধু-সভ্যতার প্রধানকেন্দ্র মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পায়। বৈদিক যুগের পূর্ববর্তী ভারতীয় সভ্যতার খবর পাওয়া যায় ঐ সভ্যতার বিবরণ থেকে। এই যুগকে পণ্ডিতেরা 'তাম্র-প্রস্তর যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। প্রস্তর যুগের শেষ ও তাম্রযুগের সূত্রপাতের সন্ধিকালকে বলা হয় 'তাম্র-প্রস্তর যুগ'। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় সভ্যতা মিশর ও মেসোপোটেমিয়া-ব্যাবিলনের সভ্যতার প্রায় সমকালীন বলে অনুমান করা হয়েছে। সিন্ধুনদের তীরবর্তী সভ্যতা তাই নীল-নদ এবং ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রীস নদীর তীরবর্তী সভ্যতার মতোই প্রাচীন বলে স্বীকৃত হয়েছে।

১৯২০ সালের কাছাকাছি সময়ে বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলায় অবস্থিত মহেনজোদাড়ো এবং পাঞ্জাবের মন্টগোমরি জেলার হরপ্পাতে খননকার্যের ফলে সিন্ধু-সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ব্যাপারে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার জন মার্শাল, দয়ারাম সাহানী, ননীগোপাল মজুমদার ও স্যার মার্টিমার হুইলার প্রমুখ পণ্ডিতদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সময়ে গুজরাটের রংপুর, লোথাল প্রভৃতি স্থানে, উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবের রূপার অঞ্চলে, রাজস্থানের বিকানীরে এবং মীরাটের কাছে আলমগীরপুরে প্রাচীন সভ্যতার যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা সিন্ধুসভ্যতার অনুরূপ বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান। প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতা যে তাই ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল একথা মনে করা চলে। সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন হিসাবে প্রাপ্ত লিপিগুলোর পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয় নি। এই লিপির মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্যই জানা যাবে। পণ্ডিতদের অনুমান সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে মেসোপোটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার মিল আছে; আবার অনেকে মনে করেন তা দক্ষিণভারতের প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতারই প্রকাশ। এই সব মতভেদ সত্ত্বেও সিন্ধুসভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতেরা সকলেই একমত।

মহেনজোদাড়ো কথাটির অর্থ হচ্ছে 'মৃতব্যক্তিদের ঢিবি'; লারকানার ঐ অঞ্চলের স্থানীয় লোকেরা এই নামেই সিন্ধুনদের তীরবর্তী সমতল ক্ষেত্রের ঐ উঁচু ঢিবিটিকে জানত। এই উঁচু ঢিবির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো আজ পর্যন্ত অত্যন্ত উর্বর ক্ষেত্র; এখানে ফসল এত ভাল হয় যে এই অঞ্চল 'সিন্ধুর উদ্যান' নামে পরিচিত। জানা গেছে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এখানে একটি বিরাট শহর গড়ে উঠেছিল। পণ্ডিতদের অনুমান এই শহরটি প্রায় সাতবার বন্যায় ধ্বংস হয় এবং আবার নূতন করে নির্মিত হয়।

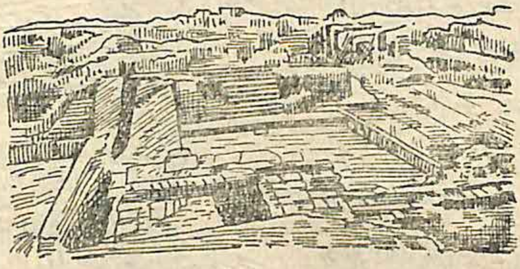
সিন্ধুনদের সর্বনাশা বন্যাই যে এই ধ্বংসের কারণ তা অনুমান করা চলে। শেষ পর্যন্ত বহু শতাব্দীর পর এই শহরটি পরিত্যক্ত হয় বলেই মনে হয়।

মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পাতে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলো নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা করছেন। তবে এযাবৎ যা জানা গেছে তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সিন্ধুসভ্যতা মূলতঃ ছিল নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতা। মহেনজোদাড়ো শহরটি ছিল আকারে যথেষ্ট বিরাট; ঐ শহরে বহু সংখ্যক বসতবাড়ী ছিল। বাড়ীগুলোর আকার নানা রকমের। দু' কামরার ছোট বাড়ী যেমন আছে, তেমনি বিরাট প্রাসাদের মতো বাড়ীও আছে। বাড়ী ঘিরে চার থেকে পাঁচ ফুট প্রশস্ত দেয়াল; ইটের তৈরী বড় বড় এই অট্টালিকাগুলো ধনীদের প্রাসাদ বলে অনুমান করা হয়। পোড়া ইটের বাড়ী-গুলোর ভগ্নাবশেষ থেকে গৃহনির্মাণের ব্যাপারে অধিবাসীদের দক্ষতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। দোতলা বাড়ীর সংখ্যাই বেশী তবে তিনতলা বা তার চেয়ে উঁচু বাড়ীও রয়েছে। বাড়ীগুলোর মেঝে সযত্নে পালিশ করা, প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে যুক্ত বারান্দা রয়েছে, দরজা, জানালা ও বেয়ে-ওঠার সিঁড়ি রয়েছে। সব চেয়ে যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার তা হচ্ছে প্রত্যেক বাড়ীতেই আলাদা পাতকুয়ো, স্নানের ঘর এবং জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে।



মহেনজোদাড়োর নাগরিক

বহুসংখ্যক বসতবাড়ী ছাড়া অনেকগুলো সুপরিকল্পিত বিরাট বিরাট বাড়ীর সন্ধান ওখানে মিলেছে। তার মধ্যে অনেকগুলোকে বড় বড় খিলান দেওয়া হলঘরের মতো মনে হয়; এক একটি হলঘরের আয়তন প্রায় ৮০ বর্গফুট। এই সভাগৃহগুলো কী কাজে লাগত তা স্পষ্ট নয়। তবে অনুমান করা যায় ঐগুলো হয় ধনী ব্যক্তিদের প্রাসাদ, মন্দির বা পৌরসভাগৃহ। মহেনজোদাড়োতে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য একটি বিরাট স্নানাগার ও সাঁতার দেওয়ার পুকুর



মহেনজোদাড়োর স্নানাগার

ছিল। পুকুরটি ৩৯ ফুট দীর্ঘ, ১৩ ফুট প্রশস্ত এবং প্রায় ৮ ফুট গভীর। সিড়ি বেয়ে উপরে ওঠার ব্যবস্থা দুপাশে রয়েছে। পুকুরের চারপাশে বসে সন্তরণ প্রতিযোগিতা দেখার মতো গ্যালারি রয়েছে এবং অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর রয়েছে এবং তাতে গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা রয়েছে। পার্শ্ববর্তী একটি ঘরের মধ্যে অবস্থিত কুয়ো থেকে পুকুরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। একটি উঁচু পয়ঃ-প্রণালীর সাহায্যে পুকুরের ময়লা জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সম্পূর্ণ স্নানাগারটি ১৮০ ফুট লম্বা ও ১০৮ ফুট প্রশস্ত এবং তার চারপাশে আট ফুট পুরু দেয়াল রয়েছে। স্নানাগারটির নির্মাণ-কৌশল এতই উন্নত যে আজ প্রায় পাঁচ হাজার বছর পরও তা টিঁকে আছে।

শহরের রাস্তাগুলো ছিল সোজা ও চওড়া; গলিগুলো সোজা

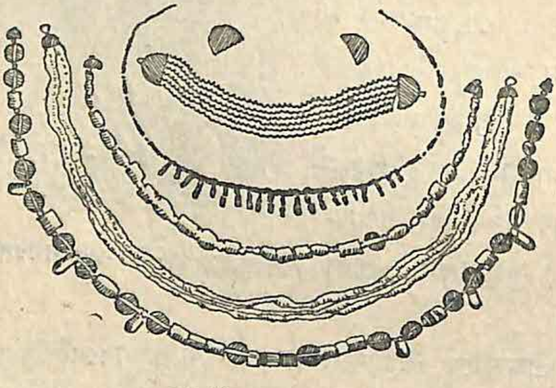
বড় রাস্তায় এসে মিশত। একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করা যায়; শহরের বাড়ীগুলোর বড় রাস্তার দিকে কোনো দরজা বা জানালা ছিল না। পণ্ডিতদের অনুমান, আকস্মিক বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই বোধহয় এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শহরে জল-নিকাশের জন্য পাকা নর্দমা ও ঢাকা-দেওয়া নালীর ব্যবস্থা ছিল। এ থেকে স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা যে অত্যন্ত উন্নত ছিল তা প্রমাণিত হয়। সমসাময়িক পৃথিবীর অন্য কোনো প্রাচীন নগর-জীবনে জনস্বাস্থ্যরক্ষার এমন সুপরি-কল্পিত আয়োজন দেখা যায় না।



মহেনজোদড়োর নগরপথ

সামগ্রিকভাবে মহেনজোদাড়োর নগরজীবনের ভগ্নাবশেষ থেকে জানা যায় গমই ছিল অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। তারা বার্লি এবং খেজুরও খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতেন। অধিবাসীরা মাছ, মাংস ও ডিম খেতেন। তারা সাধারণতঃ সূতীবস্ত্র ব্যবহার করতেন এবং পশম ও গরম কাপড়চোপড় ব্যবহার করতেন। ধাতুর ব্যবহার থেকে একটি সভ্যতার অগ্রগতির অনুমান করা যায়। ঐ সময়ে তামা, রূপা, ব্রোঞ্জ ও চীনামাটির ব্যবহার ছিল। সিন্ধু সভ্যতার যুগে লোহার ব্যবহার ছিল না। অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার ছিল খুবই কম। ঐ সময়ে পোড়ামাটির বিশেষ প্রচলন ছিল। নরনারী সকলেই হার, আংটি, বালা ইত্যাদি নানা রকম অলঙ্কার পরতেন। স্ত্রীলোকেরা নাকছাবি, দুল ও নূপুর পরতেন। হাতীর দাঁতের নানা রকম অলঙ্কার এবং দামী পাথরেরও

প্রচলন ছিল। কুমোরের-চাক প্রচলিত ছিল তাই সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির পাত্র ও বাসনপত্র নানা কাজে ব্যবহৃত হত। মাটির পাত্রে নানা রকম চিত্রবিচিত্র করার নিয়ম ছিল, কিছু কিছু পাত্রে পালিশের কাজও করা হত। তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা ও চীনামাটির পাত্র নির্মিত হত কিন্তু সেগুলো ছিল সংখ্যায় অনেক কম। লোহার কোনো রকম জিনিসপত্র মহেনজোদাড়োতে পাওয়া যায় নি। তাই সিন্ধুসভ্যতা লৌহযুগের অনেক পূর্ববর্তী বলেই পণ্ডিতেরা মনে করেন। কাপড় বোনার জন্য পোড়ামাটির, চীনামাটির ও ঝিনুকের



নানাবিধ অলংকার

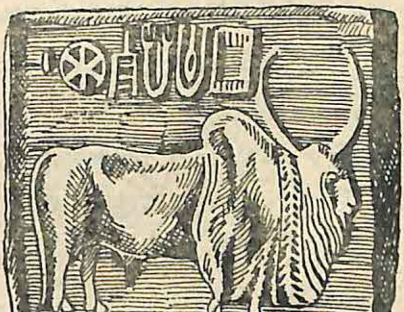
মাকু ব্যবহৃত হত। হাতীর দাঁত বা হাড় দিয়ে সূঁচ, চিরুনি তৈরী করা হত ; তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে টাঙ্গি, কুড়াল, ছুরি, কাঁচি, কাস্তে, কাটারি, বড়শি, দাঁড়ি কামানোর ক্ষুর ইত্যাদি তৈরী করা হত। চতুষ্কোণ পাথরের খণ্ড দিয়ে সম্ভবতঃ ওজনের কাজ করা হত। শিশুদের খেলনা, ছোট ছোট চাকাযুক্ত গাড়ী প্রভৃতি পাওয়া গেছে। তা থেকে জিনিসপত্র বহনের জন্য পশুদিয়ে টানা গাড়ীর প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। পাশা খেলার গুটি পাওয়া গেছে তাই পাশা খেলার প্রচলন ছিল বলেও অনুমান করা হয়।

গরু, ষাঁড়, বলদ, মোষ, ভেড়া, হাতী ও উট ছিল প্রধান গৃহ-পালিত পশু। গৃহপালত পশু হিসাবে ঘোড়ার কোনো উল্লেখ

মিলে নি। মাটির পাত্রে ও শিশুদের খেলনার গায়ে কুকুরের ছবি রয়েছে তাই গৃহপালিত কুকুর ছিল এটা বোঝা যায়। গৃহপালিত পশু হিসাবে বিড়ালের কোনো উল্লেখ মিলে নি।

যুদ্ধবিগ্রহের সময় কুঠার, বর্শা, ছোরা, দণ্ড, বল্লম প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। তীর ধনুকের তেমন বহুল ব্যবহার ছিল বলে মনে হয় না। তলোয়ারের ব্যবহার ছিল না এবং বর্ম, শিরস্ত্রাণ বা আত্ম-রক্ষার জন্য ব্যবহৃত জিনিসপত্রের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিছু কিছু অস্ত্রপাতি পাথরের তৈরী। এই সকল তথ্যের ভিত্তিতেই পণ্ডিতদের অনুমান সিন্ধুসভ্যতা হচ্ছে তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা।

পোড়ামাটির তৈরী ছোট ছোট পাঁচ শতাধিক সীলমোহর মহেন-জোদাড়োতে পাওয়া গেছে। তাদের অনেকগুলোর গায়ে নানা প্রকৃত ও কাল্পনিক জীবজন্তুর ছবি রয়েছে। এই সীলমোহরগুলোর গায়ে নানা অক্ষর খোদাই করা রয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত এগুলোর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন সীলমোহরের গায়ে চমৎকার- ভাবে জীবজন্তুর ছবি খোদাই করা রয়েছে। হরপ্পাতে পাথরের যে মূর্তিগুলো পাওয়া গেছে তা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে নির্মিত এবং ভাস্কর্যের প্রচুর উন্নতিরই তা প্রমাণ।



সিন্ধু সভ্যতার সুবিখ্যাত সীলমোহর

পণ্ডিতেরা মনে করেন সীলমোহরগুলো সাধারণতঃ ব্যবসাবাণিজ্য এবং বিনিময়কালে ব্যবহার করা হত। তারা যে শুধু ভারতের নানা অঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করতেন তা নয়, এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করা হত। টিন, তামা ও মূল্যবান পাথরগুলো বিদেশ থেকে আনা হয়েছে বলেই মনে করা হয়।

কামার, কুমার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী, হাতীর দাঁত ও পাথর দিয়ে অলঙ্কার তৈরী করার মতো দক্ষ শিল্পীরা যে ঐ সমাজে ছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কৃষিকার্যে সিন্ধুসভ্যতা যে বিশেষ উন্নত হয়েছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। গম, বার্লি ও তূলাই ছিল প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। পাথরের মধ্যে ছিদ্র করার ব্যবস্থা, ধাতুগলানো, কুমারের চাকের ব্যবহার এবং ভাঁটা দিয়ে ইট পোড়ানোর ব্যবস্থা ছিল ঐ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির প্রমাণ।

মহেনজোদাড়োতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস এবং দেবদেবীর পূজা-অর্চনা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। মাতৃরূপিণী শক্তির আরাধনা প্রচলিত ছিল মনে হয়। সকল সৃষ্টির কারণ হিসাবে মাতৃবন্দনা করা হত। তারই পাশাপাশি ত্রিমুখ-বিশিষ্ট, বহু পশুপরিবৃত যে দেবমূর্তিটি একটি শীলমোহরে আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে পণ্ডিতেরা 'পশুপতিনাথ' মহাদেবের মূর্তি বলে অনুমান করেছেন। এই সব থেকে অনুমান করা হয় যে শিব ও শক্তির আরাধনা ঐ সময়ে প্রচলিত ছিল। এই সকল দেবদেবীর পাশাপাশি গাছ, পাথর, সাপ, ষাঁড়, কুমীর প্রভৃতির পূজার প্রচলন ছিল। ধর্মবিশ্বাস ও পূজাঅর্চনার ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য ছিল এটা অনুমান করা চলে এবং আদিম ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি অনেকটা উন্নত ধর্মচিন্তারও প্রমাণ মিলে। কিন্তু যে কথা খুবই লক্ষ্য করার মতো তা হচ্ছে মন্দির বা দেবস্থান মনে করা চলে এমন কোনো কিছু মহেনজোদাড়োতে আবিষ্কৃত



পশুপতিনাথ

হয় নি। তবে সিন্ধুসভ্যতার সময়কার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে হিন্দুধর্মের মূলগত নানা মিল সহজেই নজরে পড়ে।

বৈদিক সভ্যতার আগেকার ভারতের এই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ভারতের আদিম সভ্যতার সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। সিন্ধুনদের আকস্মিক প্লাবন বা শক্তিশালী বিদেশী আক্রমণে এই প্রাচীন সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যায় বলে অনেকে অনুমান করেছেন। প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এটা বোঝা যায় যে মেসোপোটেমিয়ার সুমেরীয়দের সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের কিছু কিছু যোগাযোগ ছিল। অন্যদিকে বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে মহেনজোদাড়োর সভ্যতার পার্থক্য রয়েছে। মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পাতে খননকার্যের ফলে যে নিদর্শনগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে তা নব্যপ্রস্তর যুগ ও তাম্রযুগের সন্ধিকালের বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। সিন্ধু সভ্যতা তাই আজ থেকে প্রায় পাঁচহাজার বছর আগের বলে অনুমান করা হয়েছে। আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলো নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে। তবে যে সব তথ্য জানা গেছে তাতে সমাজে শ্রেণীবিভাগের প্রাথমিক চিহ্নগুলো লক্ষ্য করা যায়। ঘরবাড়ী গুলোর যে ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ীর পাশাপাশি ধনী লোকদের বিরাট অট্টালিকার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। মূল্যবান যে সব অলঙ্কার ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে তা ব্যবহার করা সাধারণ মানুষের সঙ্গতির মধ্যে ছিল না তা সহজেই বোঝা যায়।

সমাজে শ্রেণী-বিভাগের সূত্রপাত

তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সিন্ধু সভ্যতার প্রাপ্ত নিদর্শন ভারতের ইতিহাসের প্রাচীনতার সুস্পষ্ট প্রমাণ হয়ে রয়েছে।

চার ॥ চীনের প্রাচীন সভ্যতা

মেসোপোটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতার মতোই চীনের প্রাচীন সভ্যতা খৃষ্টের জন্মের হাজার হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীন অন্যান্য সভ্যতার মতোই চীনের সভ্যতা প্রথমে গড়ে উঠেছিল হোয়াং হো নদীর তীরবর্তী উর্বর অঞ্চলে। হোয়াং হো ও ইয়াংসি কিয়াং নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চলে চীনের ও পৃথিবীর প্রাচীনতম একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় খৃষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে থেকে। তার আগের কাহিনী নানা রকম জনশ্রুতি ও গল্প-কথার মধ্য দিয়ে চলে এসেছে।

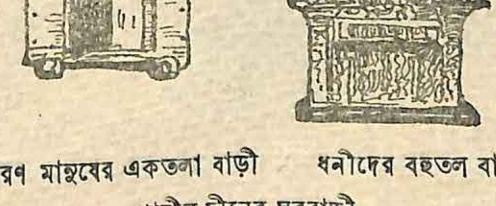


চীনের সভ্যতা

মোসোপোটেমিয়া ও মিশরের মতোই প্রাচীন চীনের অধিবাসীদের হোয়াং হো নদীর বন্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচতে হয়েছিল। বাঁধ বেঁধে কৃত্রিম উপায়ে বন্যার জল ঠেকাতে হত। বাঁধ না বাঁধলে হোয়াং হো চীনাদের কোনো উপকারে আসত না বরং অশেষ দুঃখ ও সর্বনাশের কারণ হত। প্রাচীনকাল থেকে হোয়াং হো নদী 'চীনের দুঃখ' নামে পরিচিত ছিল। অতি প্রাচীনকালেই চীনাদের তাই বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ করতে হয়েছিল এবং খাল কেটে গ্রীষ্মকালে জমির সেচের জন্য চারদিকে জল ছড়িয়ে দিতে হত। হোয়াং হো নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ছিল খুবই উর্বর; তাই খৃষ্টের জন্মের বেশ কয়েক হাজার বছর পূর্ব থেকেই এখানে একটি কৃষি-নির্ভর উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাদের সংগ্রাম ও জীবনধারা ছিল প্রাচীন মিশরের জীবন ধারারই

অনুরূপ। তবে মিশরে নীল নদের বন্যার একটা নির্দিষ্ট সময়-সূচী ছিল, হোয়াং হো-র বন্যা ছিল অনেক বেশী আকস্মিক এবং তার বেগ ছিল প্রবল। ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও খাল খননের ব্যাপারে চীনাদের অনেক বেশী মনোযোগী হতে হয়েছিল। প্রাচীন কাল থেকেই খাল খনন, নৌকা ও জলযান নির্মাণে চীনারা বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিলেন। ব্রোঞ্জের আবিষ্কারের পর চীনারা জলযান নির্মাণের ব্যাপারে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। জলসেচের মাধ্যমে কৃষির কাজে তারা বিরাট অগ্রগতি লাভ করেন। একটি উন্নত কৃষিসমাজের অঙ্গ হিসাবে বছরের ঋতু-চক্র নিয়ে আলোচনা, নক্ষত্র-বিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা অতি প্রাচীন কালেই চীনে শুরু হয়।

প্রাচীন চীনে বন্যার ভয় সব সময় মানুষকে অস্থির করে রাখত। তাই বন্যাকে কেন্দ্র করে নানা উপকথা প্রাচীন চীনে প্রচলিত ছিল। আর তারই পাশাপাশি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাচীন কালে চীনাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল। প্রাচীন চীনেই সর্বপ্রথম 'কম্পাসের' আবিষ্কার হয়। নৌ চালনাকালে দিক ঠিক করার জন্য কম্পাসের গুরুত্ব অনেক। ঘরবাড়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাচীন

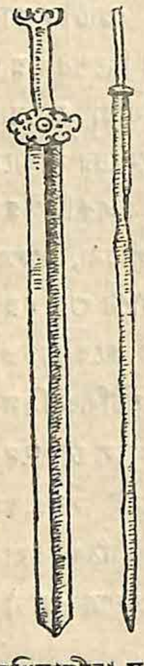


সধারণ মানুষের একতলা বাড়ী ধনীদের বহুতল বাড়ী

প্রাচীন চীনের ঘরবাড়ী

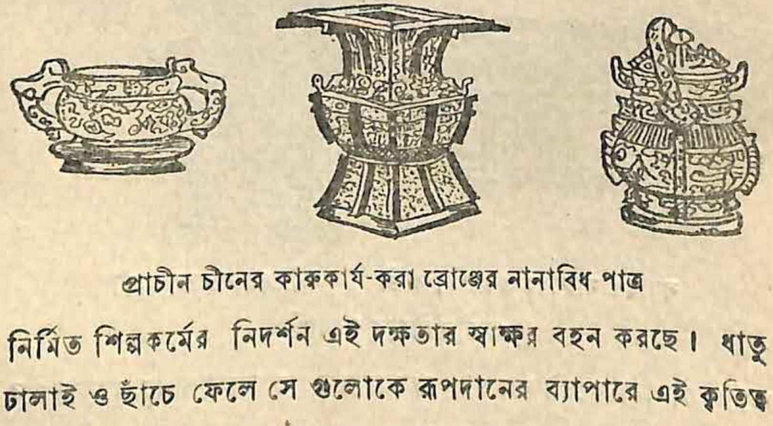
কালে চীনারা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। হালকা অথচ আরামপ্রদ গৃহ নির্মাণে তারা সুদক্ষ ছিলেন।

পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে হোয়াং হো নদীর অববাহিকায় লক্ষ লক্ষ বছর আগে আদিম মানুষের বসতি ছিল। এই আদিম মানুষকে 'পিকিং মানুষ' নামে পণ্ডিতেরা



অভিহিত করেছেন। আগুনের ব্যবহার অনেক প্রাচীন কালেই চীনের মানুষেরা আয়ত্ত করেছিলেন। প্রস্তর যুগে শিকার ও ফলমূল সংগ্রহই ছিল এদের জীবিকার প্রধান উপায়। পশু পালন, আগুনের ব্যবহার এবং আদিম কালের কৃষিকার্যকে ভিত্তি করেই প্রাচীন চীনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

নব্য প্রস্তরযুগের অবসানের পর ধাতুর ব্যবহার শুরু হলে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাচীন চীনের অধিবাসীরা প্রচুর ও উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রপাতি, কৃষির সাজ-সরঞ্জাম এবং নিত্য ব্যবহারের জিনিসপত্র নির্মাণের ব্যাপারে চীনের অধিবাসীরা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। প্রাচীন চীনের ধাতু-



প্রাচীন চীনের কারুকার্য-করা ব্রোঞ্জের নানাবিধ পাত্র

নির্মিত শিল্পকর্মের নিদর্শন এই দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করছে। ধাতু ঢালাই ও ছাঁচে ফেলে সে গুলোকে রূপদানের ব্যাপারে এই কৃতিত্ব উন্নত শিল্প-কৃতিত্বের প্রমাণ হয়ে আছে। কুমোরের চাক এবং নানা

রকম মাটির পাত্রের নির্মাণের ব্যাপারে প্রাচীন চীনের অধিবাসীদের পারদর্শিতার কথা সুপরিচিত। আরো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল বস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা। চীনেই সর্বপ্রথম রেশমের ব্যবহার শুরু হয়। তূলো, সূতো এবং রেশমের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাচীন চীনে প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

প্রাচীন চীনের সভ্যতার একটি প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে লিখিত ভাষার ব্যবহার এবং পৃথিবীর মধ্যে চীনেই সর্ব প্রথম কাগজের উপর ছাপ দিয়ে লিখিত ভাষার প্রচলন হয়। প্রাচীন চীনের ভাষা ছিল চিত্র-নির্ভর। ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করা হত। আদিম সমাজে ছবি এঁকে ভাষার ব্যবহার সর্বত্র প্রচলিত ছিল। এই ভাষাকে বলা হয় 'চিত্র-ভাষা'। প্রাচীন মিশরে চিত্র-নির্ভর ভাষা ক্রমে ধ্বনি-নির্ভর অক্ষর দিয়ে লেখা ভাষায় পরিণত হয়। আধুনিক কালে আমরা যেমন স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সাহায্যে আমাদের মনের ভাবকে শব্দের পর শব্দ লিখে ব্যক্ত করি অনেকটা সেই রকমের। কিন্তু চীনের লিখিত ভাষা আজ পর্যন্ত সেই চিত্রনির্ভর অর্থাৎ পর পর ছবি এঁকে এঁকে মনের ভাব বোঝানোর ভাষাই রয়ে গেছে। আরো একটা বিষয় খুবই ভালো করে লক্ষ্য করার মতো। বাংলা বা ইংরেজী ভাষা আমরা বাঁ দিক থেকে শুরু করে ডান দিকে লিখে যাই; উর্দু ও আরবী ভাষা আমরা ডান দিক থেকে শুরু করে বাঁ দিকে লিখি কিন্তু চীনা ভাষা লেখা হয় উপর থেকে নীচের দিকে লাইন করে। ভাষায় ব্যবহৃত চিত্রগুলো অক্ষর নয় তারা এক একটি ভাবের এবং অনেক ক্ষেত্রে এক একটি পুরো বাক্যের প্রতীক।



চীনাভাষা

পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাচীন চীনের সভ্যতার বিরাট অবদান রয়েছে। প্রাচীন সভ্যতার এই উন্নত ভিত্তির উপর

দাঁড়িয়ে চীনে পরবর্তী কালে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধ একটি সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল।

পাঁচ ॥ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা সমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য গুলো

খৃষ্টের জন্মের আগেকার ৩০০০ অব্দ থেকে ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত এই প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর চারটি প্রাচীন সভ্যতার কথা আমরা আলোচনা করেছি। সেগুলো হচ্ছে (১) মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতা, (২) মিশরের সভ্যতা, (৩) ভারতের সিন্ধু সভ্যতা, এবং (৪) চীনদেশীয় সভ্যতা। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এই যে সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে নানা রকম পার্থক্য রয়েছে কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাধারণ মিলও রয়েছে।

প্রাচীন এই সভ্যতাগুলোর প্রথম এবং প্রধান মিল হচ্ছে এই সভ্যতাগুলো বিরাট বিরাট নদ-নদীর উর্বর তীরভূমি অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। এই সব ক'টি সভ্যতা নদীতীরে গড়ে ওঠার জন্য এদের অধিবাসীদের জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল কৃষিকার্য, পশু পালন এবং মৎস্য-শিকার। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে এই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন করে কৃষির জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করতে শিখতে হয়েছিল। বর্ষার ও বন্যার সময়ে ব্যবহারের জন্য নৌকা ও নানা রকম জলযান নির্মাণ করতে ওরা শিখেছিলেন।

এই সভ্যতাগুলো নদ-নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল

এই সভ্যতা গুলোর যুগ হচ্ছে নব্য-প্রস্তরযুগের শেষ এবং তামা ও ব্রোঞ্জের যুগের সন্ধি কালের যুগটি। তাই এই সব ক'টি সভ্যতার ক্ষেত্রেই কৃষিকার্যের উপকরণ যেমন, লাঙ্গলের ফাল, কাস্তে, নিড়ানি ইত্যাদি নির্মাণের ব্যাপারে তামা ও ব্রোঞ্জের প্রচলন দেখা

যায়। তাই যুগ হিসাবে এই সভ্যতাগুলোর যুগকে বলা যায় 'তাম্র-ব্রোঞ্জ-প্রস্তর যুগ'। ধাতু-গলানো ও তাকে ছাঁচে ঢেলে নানা আকার দেওয়ার পদ্ধতি এই সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

এই সভ্যতাগুলো তাম্র-ব্রোঞ্জ-প্রস্তর যুগের সভ্যতা

কুমোরের চাক তৈরীর জ্ঞান অধিবাসীদের ছিল এবং মাটির বাসন পুড়িয়ে সেগুলোকে শক্ত করে নেওয়ার পদ্ধতি এদের জানা ছিল। এই পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্য পোড়ানো ইটের ব্যবহার শুরু হয়। যে সব অঞ্চলে পাথর বেশী ছিল না সেই সব অঞ্চলে বিশেষ করে সিন্ধু অঞ্চলে ও মেসোপোটেমিয়াতে পোড়া ইট ও টালির ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল। ঘরবাড়ী, মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণে এই ইট ও টালি ব্যবহৃত হত।

তৃতীয় যে উল্লেখযোগ্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে রয়েছে তা হল লিখিত ভাষার ব্যবহার। প্রধানতঃ ছবির মাধ্যমে নিজেদের

এক ধরনের সাংকেতিক ও চিত্র নির্ভর ভাষা, সংখ্যা, এবং সীল-মোহরের ব্যবহার ছিল

মনের কথা বুঝিয়ে বলা হত। পরে এই চিত্রগুলোকে বিভিন্ন সরল রেখার সাহায্যে অনেকটা সহজ করে তোলা হয়। সাধারণতঃ ছাপ দিয়ে রেখাচিত্র গুলোকে নরম মাটিতে ফুটিয়ে তোলা, পাথরের গায়ে খোদাই করা, তুলোট কাগজে, গাছের বাকলে, বাঁশ বা তাল পাতায় সাংকেতিক চিহ্ন ও চিত্র গুলোকে ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হত। নিজেদের মধ্যে বিনিময় এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সংখ্যার ব্যবহার ও হিসাব করতে এরা শিখেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সময় সীল ও মোহরের ব্যবহার ঐ সময়ে প্রচলিত হয়েছিল।

কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলে এই সব প্রাচীন সভ্য সমাজের অধিবাসীদের কাছে ঋতু-পরিবর্তন ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। এই ব্যাপার-

গুলো অধ্যয়নের জন্য প্রচুর সময় লাগত এবং তার জন্য প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রয়োজন হত। এই কাজ যারা করতেন সমাজে তাদের বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং তাদের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাকে সাধারণ মানুষ মন্ত্রশক্তি ও দৈবশক্তি বলে মনে করতেন। এই বিশেষজ্ঞ লোকজনেরা পুরোহিত, প্রধান বা পণ্ডিত ব্যক্তি বলে সমাজে বিশেষ সম্মান পেতেন। এই পুরোহিত, বিদ্বান ও দৈবজ্ঞরা শাসক রাজা ও সামন্ত প্রভুদের মতোই প্রবল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এরা সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হন। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা ও আরাধনা করার ভার পুরোহিতদের উপর অর্পিত ছিল। প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য নানা রকম প্রাকৃতিক শক্তি ও দেব-দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে এক প্রকার ধর্মবিশ্বাস এই সময়ে প্রচলিত ছিল।

নক্ষত্রবিদ্যার আলোচনা ও দেব-দেবীর পূজার প্রচলন হল

এই প্রাচীন সভ্যতাগুলোর সময়ে কৃষিকার্য ছিল অত্যন্ত শ্রম-সাধ্য। এই শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতেন সাধারণ মানুষেরা ; সমাজের প্রধান ব্যক্তিগণ, পুরোহিত ও বিদ্বানগণ কোনো শারীরিক শ্রম করতেন না। তারা যুদ্ধবিদ্যা, জ্ঞানচর্চা ও পূজা-অর্চনার কাজ নিয়ে থাকতেন। এদের এই কাজের বিশেষ গুরুত্ব ও প্রয়োজন ছিল। তাই সাধারণ মানুষ এদের জন্য পরিশ্রম করাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থা একটি বংশানুক্রমিক ও পারিবারিক অধিকারে দাঁড়িয়ে যায়। এভাবে সমাজে ভেদ-বিভেদ স্থায়ী শ্রেণীগত রূপ লাভ করে। আদিম সমাজে যে সমতার দৃষ্টান্ত দেখা যায় এই সভ্যসমাজগুলোতে তার অবসান ঘটেছে এটা খুবই ভালো ভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।

সামগ্রিক গোষ্ঠী-জীবনের অবসান ঘটল এবং যৌথ-পরিবার গুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছোট ছোট পরিবারের উদ্ভব হল। বিভিন্ন পরিবারগুলোর মধ্যে নানা প্রকার শ্রম-বিভাগের সৃষ্টি হল।

কৃষিজীবী, তাঁতী, জেলে, কুমোর, কামার, ছুতোর, স্বর্ণকার ও ধাতু-শিল্পীদের পরিবারগুলো দেখা দিল। এই পরিবারগুলো নিজের নিজের কাজে নানাবিধ দক্ষতা অর্জন করে সমাজের পক্ষে নিজেদের অপরিহার্য করে তুললেন। এ ভাবে গ্রামীন সমাজ-জীবনের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পর-নির্ভরশীল সুস্পষ্ট রূপ ধীরে ধীরে দেখা দিল।

সমাজে শ্রেণী-বিভাগের ও গ্রাম-জীবনের সূত্রপাত হয়েছে

হাজার হাজার মাইল দূরে দূরে অবস্থিত এই সভ্যতাগুলো সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাছাড়া এই সময়ের লিখিত ধারাবাহিক কোনো বিবরণ বা ইতিহাস আমাদের জানা নেই। তাই নানা রকম নিদর্শন থেকে বহু যত্নে ও পরিশ্রমে ঐতিহাসিকগণকে প্রাচীন সমাজের একটি গ্রহণযোগ্য বিবরণ রচনা করতে হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে একটি মোটা-মুটি চিত্রই আমরা আজ পর্যন্ত পেয়েছি। তবে আদিম সমাজের সমতার যুগ শেষ হয়ে সমাজে ক্রীতদাস ও ভূমিদাস যুগের সূত্রপাতের সময়ের সভ্যতা হিসাবেই এই সভ্যতাগুলোকে চিহ্নিত করা চলে। এই যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ধীরে ধীরে মানব সমাজ লৌহ-যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। আদিম যুগের অবসানের পর মানবজাতি ইতিহাসের এক নূতন যুগে এসে পৌঁছেছেন এটাই হল এই প্রাচীন সভ্যতা গুলোর সব চেয়ে বড় অবদান। প্রকৃতির শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস রচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহ যুগ ঃ
পৃথিবীর নানা অঞ্চলের সমাজ জীবন

লোহার ব্যবহার ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে তা সঠিক ভাবে বলা কঠিন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লোহা প্রথম আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয়েছে। মিশরের পিরামিডের মধ্যে পাঁচ হাজার বছর আগেকার লোহার তৈরি এক খানি ছুরি পাওয়া গেছে। তবে খৃষ্টের জন্মের প্রায় দু হাজার বছর আগে মিশরে লোহার আরো অধিক ব্যবহার ছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। খৃষ্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে লোহার ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয় এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সময় থেকেই তাই পৃথিবীতে লৌহ-যুগের শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয়।

লোহার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষের ইতিহাসে যথার্থ সভ্যতার যুগ শুরু হল বলা চলে। সভ্য মানুষের জীবনের যা কিছু ব্যবহার্য জিনিস তার সব কিছুই লোহা ও লোহার উন্নততর নানা রকম মিশ্রিত ধাতু দিয়ে তৈরি। আধুনিক সভ্য জীবনের ভিত্তি হচ্ছে ইস্পাত—আর এই ইস্পাত আসলে লোহা থেকেই তৈরি। লোহা এক হিসাবে সভ্য জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় ধাতু। যখন আদিম মানুষ প্রথম লোহার ব্যবহার শুরু করেছিলেন সেটা ঘটে ছিল অনেকটা আকস্মিকভাবে। লোহার মিশেল দেওয়া পাথর দাবানলের প্রচণ্ড আগুনের উত্তাপে লোহায় পরিণত হয় এবং আদিম মানুষ প্রথমে এই লোহাই তাদের নানা কাজে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন।

অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে হলেও লোহার ব্যবহার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হাতিয়ারপত্র অনেক উন্নত হল। কৃষির যন্ত্রপাতি, যেমন—লাঙ্গলের ফাল, কাস্তে, নিড়ানি ইত্যাদি অনেক মজবুত, ধারালো এবং কার্যকর হল। শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য অস্ত্রপাতির ক্ষেত্রে, শিকারের হাতিয়ারের ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি হল। ঘর-বাড়ি, দালান ও প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে লোহার ব্যবহার এক নূতন যুগের সূত্রপাত করল। লোহার আবিষ্কার, তার উন্নতি সাধন, লোহা গলানোর এবং তাকে ছাঁচে ঢেলে প্রয়োজনীয় আকার দান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষের পক্ষে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে নানাবিধ নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করা সম্ভব হল। জিনিসপত্র অনেক বেশী টেকসই হল এবং সেগুলো সহজে নষ্ট হত না। যত্ন সহকারে সেগুলোকে মেজে ঘষে ধারালো ও ঝকঝকে করে নেয়া সম্ভব হল। শান দিয়ে লোহার হাতিয়ারকে অনেক বেশী কার্যকর করে তোলা যায়। এক কথায় লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলল।

লৌহযুগে কৃষি ও হস্তশিল্প—দুয়েরই প্রচুর উন্নতি হল। লোহা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান, লোহাকে খনি থেকে তোলা, তাকে আগুনে পুড়িয়ে নিখাঁদ করে তোলা এবং অন্যান্য খনিজদ্রব্যের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে বেশী বেশী করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার মধ্য দিয়ে সমাজ এগিয়ে চলল। লোহাকে পোড়াতে এবং গলাতে প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি করতে হয়। প্রথমে কাঠ পুড়িয়ে যে কয়লা পাওয়া যায় তাকে এই কাজে ব্যবহার করা হত। তারপর এর জন্য খনিজ কয়লা আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয়। লোহা ও কয়লা যে সব অঞ্চলে পাওয়া যায় সে সব অঞ্চলকে দখলে রাখার জন্য সামন্ত প্রভুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হল। প্রবল ও শক্তিশালী সামন্ত প্রভুরাই রাজা, মহারাজা ও সম্রাট হিসেবে দেখা দিলেন। অধীনস্থ অঞ্চলের লোকজনকে দাস ও ক্রীতদাস হিসেবে এই সব রাজারা নানা কঠিন কাজে

নিয়োজিত করতেন। দাস ও সামন্তযুগের ভিত্তি লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে রচিত হল। সমাজের শ্রেণীবিভাগ অনেক পরিষ্কার হয়ে উঠল। রাজা, অভিজাত ভূস্বামীগণ এবং পুরোহিত সম্প্রদায় থাকলেন সমাজের এক দিকে আর অন্য দিকে থাকলেন দাস-শ্রমিক, ভূমিদাস ও কৃষক জনসাধারণ, হস্তশিল্পী এবং ব্যবসায়ী ও বণিকগণ।

লোহার উৎপাদন ও উৎস ক্ষেত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ এবং লোহার অস্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত সৈন্যবাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী সামন্ত প্রভুদের অর্থাৎ বড় বড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হল। কৃষি ও হস্তশিল্পের উন্নতি, যানবাহন, বিশেষ করে বড় বড় নৌকা ও জলযান প্রভৃতির নির্মাণের ফলে ব্যবসাবাণিজ্যের ও দিগ্বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হল। ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস, রোম ও চীনের এই যুগের ইতিহাস তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

এক ॥ ব্যাবিলন-এর সভ্যতা

মেসোপোটেমিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ইউফ্রেতিস নদীর তীরে ব্যাবিলন নগরী গড়ে উঠেছিল। প্রথমে ব্যাবিলন ছিল একটি ক্ষুদ্র বাণিজ্য-কেন্দ্র। মাটি ও খড় দিয়ে তৈরি কিছু সংখ্যক ঘরবাড়ি নিয়ে ব্যাবিলনের পত্তন হয়। কিন্তু ব্যাবিলন নগরীর অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের বনজ সম্পদ, পশুর চামড়া, পশম ইত্যাদি বিনিময় ও বিক্রয়ের জন্য ব্যাবিলনে নিয়ে আসতেন এবং ব্যাবিলন থেকে কৃষিজাত দ্রব্যাদি কিনে নিয়ে যেতেন। এক দিকে ব্যাবিলন ছিল উর্বর কৃষি-অঞ্চলের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, অন্যদিকে ইউফ্রেতিস নদীর তীরবর্তী এই শহরটি উত্তর ও দক্ষিণের বণিকদের একটি মিলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে ব্যাবিলন মেসোপোটেমিয়ার সব চেয়ে সমৃদ্ধ ও বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় দু হাজার বছর আগে ব্যাবিলনকে রাজধানী করে একটি কেন্দ্রীভূত সামন্ত রাষ্ট্র গড়ে উঠে। রাজা হামবুরাবি-র রাজত্বকালে (১৭৯২—১৭৫০ খৃঃ পূঃ) ব্যাবিলন বিরাট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করে। হামবুরাবি ছিলেন আমুরাইট নামক একটি আরবীয় পশুপালক বংশের লোক। আমুরাইটগণ ধীরে ধীরে সম . মেসোপোটেমিয়ার অধিকারী হয়ে দাঁড়ান। সুমের ও আর্ককাডিয়ানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং সমগ্র ব্যাবিলন রাজ্যে আমুরাইটদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

উর্বর কৃষি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে কৃষিকার্যে ব্যাবিলনের বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়। বন্যারোধের জন্য নদীতে বাঁধ দেওয়া, খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির ব্যাপারে ব্যাবিলন প্রচুর উন্নতি লাভ করে। লাঙ্গল, কাস্তে, নিড়ানি ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রেও তাদের সাফল্য ছিল বিরাট। নদীতীরে অবস্থিত ছিল বলে ব্যাবিলন একটি বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীন কালের বণিকেরা ব্যাবিলনে এসে ভীড় করতে থাকেন এবং এর ফলে ব্যাবিলন অভূতপূর্ব সমৃদ্ধিলাভ করে।

ব্যাবিলনের রাজারা ছিলেন জমিদারদের রাজা। পুরোহিত ও বড় বড় জমিদারদের স্বার্থরক্ষার প্রতি রাজারা বিশেষ যত্ন নিতেন। রাজা হামবুরাবি যে সব আইনকানুন প্রবর্তন করে-ছিলেন তা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই সময়ে সমাজে পুরোহিতদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। পুরোহিতগণ ঋতু-পরিবর্তন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, বছর মাস দিন ক্ষণ প্রভৃতির হিসাব রাখা সম্পর্কে আলোচনায় নিযুক্ত থাকতেন। তাঁরা লিখিত ভাষায় নিজেদের বক্তব্য হাজির করতে জানতেন। বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করে সন্তুষ্ট রাখার ভার পুরোহিতদের ওপর অর্পিত ছিল। রাজা নিজেকে দেবতাদের প্রতিনিধি বলে দাবি করতেন এবং পুরোহিতগণ রাজাদের এই দাবি সঠিক বলে প্রচার করতেন। পুরোহিতদের

প্রচারের মূল কথা ছিল: "স্বাধীন মানুষেরা অর্থাৎ জমিদার, বড় বড় বণিক ও ধনীরা হচ্ছেন ঈশ্বরের ছায়া, দাসরা হচ্ছে স্বাধীন মানুষের ছায়া; রাজা আসলে ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি।" সমাজের সকল প্রকার সুখ ও সুবিধা ছিল রাজা, পুরোহিত, জমিদার ও বণিকদের জন্য; সাধারণ মানুষ ও ক্রীতদাসগণকে দিনরাত পরিশ্রম করতে হত। ব্যাবিলনের সভ্যতা তাই ছিল একটি দাস সমাজ-ব্যবস্থা।

পুরোহিতগণই ছিলেন ঐ সময়ের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এরা নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় নিযুক্ত থাকতেন। গ্রহ ও নক্ষত্রের গতিবিধি সম্পর্কে তারা প্রচুর জ্ঞানলাভ করেছিলেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাবিলনের দান

তারা সূর্য ও চন্দ্র-গ্রহণ সম্পর্কে হিসাব করে আগে থেকে বলে দিতে পারতেন। তারা বছরকে মাস, সপ্তাহ ও দিনে ভাগ করেছিলেন এবং দিনকে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডে ভাগ করতেও শিখেছিলেন। একটি ঘণ্টাকে ষাট ভাগে ভাগ করে মিনিটে এবং মিনিটকে ষাট ভাগ করে সেকেণ্ডে পরিণত করার নিয়ম ব্যাবিলনেই প্রথম প্রচলিত হয়। তারা পাঁচটি গ্রহ সম্পর্কে জানতেন। এই পাঁচটি গ্রহ এবং সূর্য ও চন্দ্রের নাম অনুসারে তারা সপ্তাহের সাতটি দিনের নামকরণ করেছিলেন। রবি মানে সূর্য, সোম মানে চন্দ্র ইত্যাদি, ইত্যাদি। এক কথায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাবিলন বিরাট উন্নতি লাভ করেছিল। একথা ঠিক, পৃথিবীর আকার এবং তার অবস্থান সম্পর্কে তাদের ধারণা সঠিক ছিল না। কিন্তু এত প্রাচীন কালে যে জ্ঞান ব্যাবিলনীয়রা লাভ করেছিলেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। মানবজাতি তাদের কাছে ঋণী। ব্যবসাবাণিজ্য ও বিনিময়ের কাজে সংখ্যার ব্যবহার করতে ব্যাবিলনীয়রা জানতেন। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ গণিতের হিসাব মতো যোগ-বিয়োগ, গুণ ও ভাগের ব্যবহার শুরু করেছিলেন। মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে এটা

একটা বিরাট অগ্রগতি। প্রাচীনকালে ব্যাবিলনের অধিবাসীরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছিলেন। রোগনির্ণয় ও তা দূর করার জন্য ওষুধের ব্যবহার করতে তাঁরা জানতেন।

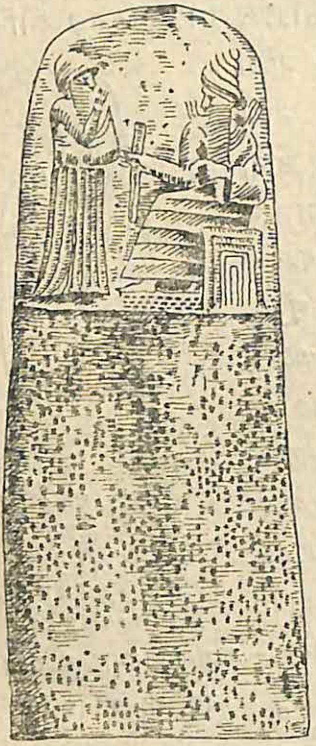
লিখিত ভাষার ব্যবহার ব্যাবিলনীয়দের আরেকটি বড় কীর্তি। এই ভাষা এক রকম রেখা-চিত্রের মতো পোড়া মাটির পাত্রে অঙ্কিত হত। নরম মাটির শ্লেটে তীক্ষ্ণ শলা দিয়ে এই ভাষা লেখা হত। তারপর শ্লেটটি শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হত। এরকম অসংখ্য শ্লেট ব্যাবিলনের মাটি খুঁড়ে পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করেছেন। এদের সবগুলির পাঠ-উদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয় নি। এগুলি থেকে প্রাচীন ব্যাবিলনের সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা গেছে এবং যাবে। এই ধরনের রেখাচিত্রের ভাষাকে রৈখিক (Cuneiform) ভাষা বলে। এটাও এক ধরনের ছবির-ভাষা। রাজা হামবুরাবির বিখ্যাত আইন এই রকম রেখাচিত্র থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজা হামবুরাবির অনুশাসন থেকে ঐ সময়ের সমাজ-জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে।



সংখ্যা গণনা করছেন ব্যাবিলনের বিজ্ঞানী

১৯০৫ সালের কাছাকাছি ব্যাবিলনে খনন-কার্য চালিয়ে পণ্ডিতেরা একটি কালো শ্লেটের মতো বিরাট প্রস্তর খণ্ড আবিষ্কার করেন। তার এক পাশে উপরের দিকে একটি চিত্র অংকিত রয়েছে, তাতে দেখা যায় একজন অন্যজনকে কী একটা জিনিস দান করছেন। পাথরের সারা গায়ে রেখাচিত্রের ভাষায় নানা কথা অঙ্কিত রয়েছে। পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা করে এটাকে

'হামবুরাবির অনুশাসন' বলে চিহ্নিত করেছেন। তা থেকে হামবুরাবির শাসন কাল সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে। হামবুরাবি ১৭৯২ থেকে ১৭৫০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত ৪২ বছর রাজত্ব করেছেন। এই সময়ে ব্যাবিলন এতই সমৃদ্ধ ছিল যে রাজা হামবুরাবি একটি সুসজ্জিত সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন এবং সমগ্র মেসোপোটেমিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসহ এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলে ছিলেন। কিন্তু হামবুরাবির মৃত্যুর পরই বিরাট ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। উত্তরাঞ্চলের ইরাণ-সীমান্তের নিকটবর্তী পাহাড়ী আসিরীয় জাতি ব্যাবিলন দখল করে এক নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সময়ে বাণিজ্যপথের পরিবর্তন হয় এবং ব্যাবিলন নগরের সমৃদ্ধির অবসান ঘটে। আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্যাবিলনের উপর পারস্যের অধিকার স্থাপিত হয় এবং ৩৩০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে ব্যাবিলন গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দারের অধীনস্থ হয়। মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের এভাবে সমাপ্তি ঘটে।



হামবুরাবির অনুশাসন লাভ

কিন্তু হামবুরাবির অনুশাসন থেকে প্রাচীন ব্যাবিলন সাম্রাজ্য সম্পর্কে যা জানা গেছে তাতে দেখা যায় ব্যাবিলন ছিল প্রাচীন মিশরের মতোই দাস-প্রভুদের শাসনাধীন একটি রাষ্ট্র। হামবুরাবির অনুশাসনে লেখা আছে :

"কোনো ব্যক্তি যদি মন্দির ও রাজার সম্পত্তি চুরি করে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে ; যে ব্যক্তি এই চোরাই সম্পত্তি রাখবে তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

"কোনো ব্যক্তি যদি ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে চুরি করে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

"পালিয়ে-যাওয়া কোনো ক্রীতদাসকে কেউ আশ্রয় দিলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

"কোনো ব্যক্তি যদি ক্রীতদাসের দেহ থেকে পরিচয়-জ্ঞাপক চিহ্ন সরিয়ে নেয় তবে তার আঙ্গুল গুলো কেটে ফেলা হবে।

"কেউ যদি অন্য এক জনের ক্রীতদাসের প্রাণহানি করে তবে নিজের ক্রীতদাসকে ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে হবে।

"কেউ যদি অন্য একজনের বলদের প্রাণহানি করে তবে নিজের বলদ ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে হবে।

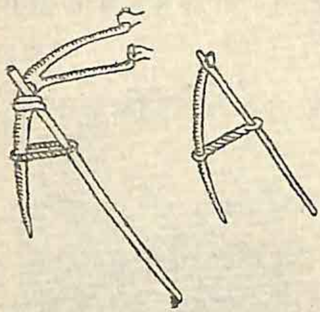
"কেউ যদি ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পারে তাহলে তাকে তার স্ত্রী, পুত্র বা কন্যাকে তিন বছরের জন্য ক্রীতদাস হিসাবে মহাজনকে দিতে হবে।......"

হামবুরাবির এই অনুশাসনগুলো রাজা, পুরোহিত, দাস-প্রভু ও সম্পত্তির মালিকদের স্বার্থরক্ষার জন্যই রচিত—এতে সন্দেহ নেই। কৃষককে জমির এক তৃতীয়াংশ খাজনা হিসাবে দিতে হত, ফলের বাগানের দুই তৃতীয়াংশ জমির মালিককে দিতে হত, রাজাকে দিতে হত ফসলের দশ থেকে পনের ভাগ। ঋণ শোধ করতে না পারলে দাস বনতে হত। খাজনা দিতে দেরী হলে সুদ ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা হত। সংক্ষেপে এই ছিল ঐ সময়ের সামাজিক ব্যবস্থা।

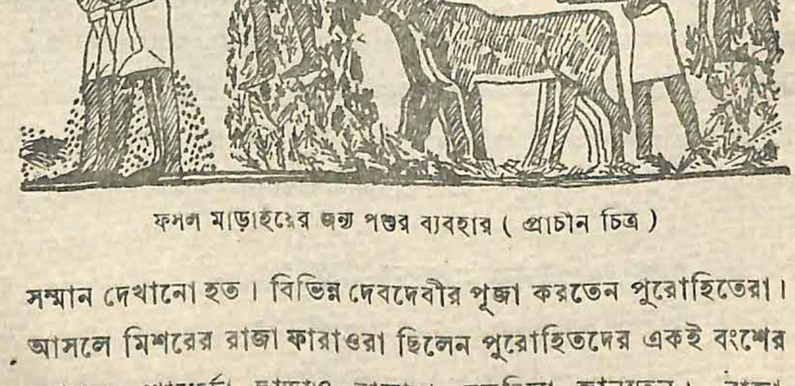
দুই ॥ প্রাচীন মিশরের রাজতন্ত্র

মিশরের প্রধান সামন্তপ্রভু বা রাজাকে বলা হত ফারাও। মিশরের সমাজে পুরোহিতদের প্রচুর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগেই নীল নদের তীরের উর্বর ক্ষেত্রে কৃষিকার্যের প্রচলন হয়। পাথরের ও হাড়ের যন্ত্রপাতি দিয়ে কৃষিকাজ করা হত। তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হওয়ার পর কৃষিকার্যের আরো উন্নতি হয়। লাঙ্গল টানার জন্য পশুদের ব্যবহার করা হত। ফসল মাড়াই-এর জন্য পশুদের ব্যবহার করা হত, কাপড় বোনা হত শনের ও তূলোর সূতো দিয়ে। মাটির ও ধাতুর বাসনপত্র এবং অন্যান্য হাতিয়ারপাতি হস্তশিল্পীরা তৈরি করতেন। এটা একটা পারিবারিক কাজকর্ম হয়ে দাঁড়ায়। কৃষিকার্যের জন্য ঋতু-পরিবর্তন ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজন হত। পুরোহিতগণ এই সব কাজ করতেন। পুরোহিতগণকে তাই প্রচুর



হাড়ের লাঙ্গলও নিড়ানি



ফসল মাড়াইয়ের জন্য পশুর ব্যবহার (প্রাচীন চিত্র)

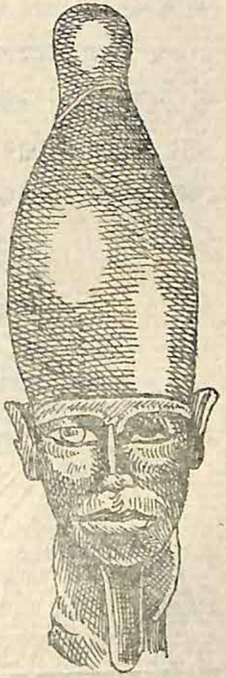
সম্মান দেখানো হত। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করতেন পুরোহিতেরা। আসলে মিশরের রাজা ফারাওরা ছিলেন পুরোহিতদের একই বংশের লোক। শাস্ত্রচর্চা ছাড়াও রাজারা যুদ্ধবিদ্যা জানতেন। রাজা,

পুরোহিত ও ধনী বণিকদের জন্য সাধারণ মানুষেরা বিনা-মজুরিতে কাজ করে দিতেন। রাজা, পুরোহিত ও অভিজাতেরা সাধারণ মানুষকে তাদের কাজকর্ম করে দিতে বাধ্য করতেন। মিশরের সমাজব্যবস্থাও তাই ছিল দাস-সমাজব্যবস্থা। ব্যাবিলনের সমাজ-ব্যবস্থার মতোই মিশরের রাজারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবি করতেন।

মিশরে নানা দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। সমাজে পুরোহিতদের প্রচুর প্রভাব ছিল। মিশরীয়রা মৃত্যুর পর 'আত্মা' বেঁচে থাকে বলে বিশ্বাস করতেন। মৃত্যুর পর মৃতদেহকে শুকিয়ে জারক রসে চুবিয়ে 'মমি' হিসাবে রেখে দেওয়া হত। বড় বড় রাজা ও সম্রাটদের 'মমি'-গুলোকে সংরক্ষণের জন্য মিশরের পিরামিডগুলো বহু অর্থব্যয় করে নির্মিত হয়। এই পিরামিড-গুলোর মধ্যে বহু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে। রাজাদের মৃতদেহের পাশে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখা হত। এই সব জিনিস থেকে প্রাচীন মিশর সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে। বিরাট বিরাট পিরামিড নির্মাণে মিশরীয়দের কৃতিত্ব আজো বিশ্ববাসীর বিস্ময় সৃষ্টি



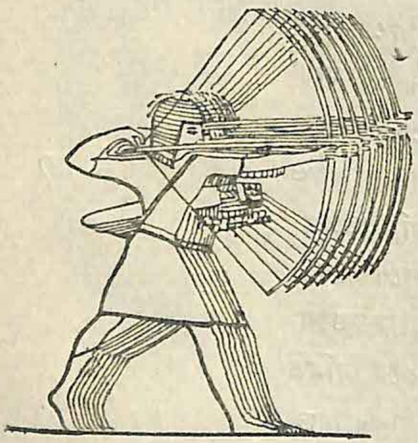
ফারাও-এর মূর্তি



বহুমূল্য মণিমুক্তাখচিত ফারাও-এর প্রস্তর নির্মিত মাথা

করে। পাথরের নির্মিত এই পিরামিডগুলো, দেবদেবীর ও ফারাওদের মূর্তি এবং বিরাট বিরাট স্ফিংকসদের মূর্তি ঐ সময়ের স্থাপত্য ও শিল্প-কর্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সব থেকে ঐ সময়ের সমাজ-জীবন সম্পর্কে অনেক কথা জানা গেছে।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে মিশরে দাস-প্রভুদের প্রায় চল্লিশটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দাস-প্রভুরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য সব সময়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতেন। ক্রমে ক্রমে মিশর দেশে শেষ পর্যন্ত তু'টি বড় রাজ্য সৃষ্টি হয়—একটি রাজত্ব ছিল উত্তরের ব-দ্বীপ অঞ্চলে এবং অন্যটি গড়ে ওঠে মিশরের দক্ষিণ অঞ্চলে। এই তুই রাজত্বের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধবিগ্রহ চলে এবং খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে মিশরে একটি কেন্দ্রীভূত ঐক্যবদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশরে এভাবে একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। এই সম্রাটেরাই মিশরে এক শক্তি-শালী রাজত্ব ও প্রাচীন সভ্যতা গড়ে তুলেন।



প্রাচীন চিত্র : মিশরের তীরন্দাজ

মিশরের শক্তিশালী সম্রাট-গণ বিরাট বিরাট স্থায়ী সৈন্য-বাহিনী গড়ে তুলেন। এই সৈন্যরা দেশের ভেতরে দাসদের বিদ্রোহ দমন করত।

মিশরের ফারাওগণ তাদের শক্তি বাড়াবার জন্য প্রতিবেশী দেশগুলো অক্রমণ করেন এবং সেগুলো জয় করে নেন। তামা ও ব্রোঞ্জের নিমিত অস্ত্রপাতি ব্যবহার করে মিশরীয় সৈন্যরা বিপুল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ছাড়া দাস-শ্রমিকদের ভাড়াটে সৈন্য দলকেও যুদ্ধের কাজে লাগানো

হত। মিশরীয় সৈন্যরা যুদ্ধকালে ঘোড়ায়-টানা রথ ব্যবহার করতেন।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর আগে ফারাও তৃতীয় তুথমোসিস বিরাট সৈন্যদল নিয়ে পালেস্টাইন ও সিরিয়া দেশ জয় করেন। ইউফ্রেতিস নদী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল মিশরের অধিকৃত হয়ে যায়। অন্যদিকে নুবিয়া অর্থাৎ নিগ্রোদের দেশ মিশরীয় সম্রাটেরা দখল করে নেন। নুবিয়া-র স্বর্ণখনি ছিল বিখ্যাত। এর ফলে মিশরের সম্রাটদের ধনদৌলতের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এই সময়ে মিশরের রাজাদের ক্ষমতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে।

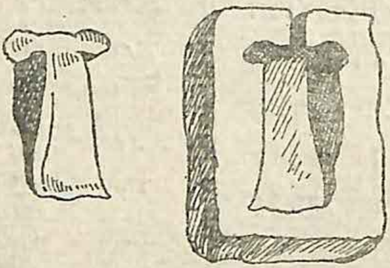


প্রাচীন মিশরের ছবির— ভাষা (HIEROGLYPHS)

মিশরীয়রা নৌ-শক্তিও গড়ে তুলেছিলেন। বড় বড় পালতোলা নৌকাকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সৈন্য চলাচলের কাজে ব্যবহার করা হত। এই সব বিজয়-অভিযানের ফলে মিশরের সম্রাটদের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি অনেক বেড়ে যায়। এই যুগকে মিশরের স্বর্ণ-যুগ বলে অভিহিত করা হয়।

এই সময়ে মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রচুর উন্নতি হয়। শাস্ত্র চর্চা, দেবদেবীর পূজা-অর্চনা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং লিখিত ভাষার উন্নতি সাধনের কাজ প্রধানতঃ পুরোহিতগণই করতেন। গণিত-বিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধাতু-শিল্প, কাগজ তৈরি এবং বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে মিশরীয়রা প্রচুর অগ্রগতি লাভ করেন।

যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যদিয়ে মিশর অন্যান্য দেশ থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং বহু সংখ্যক ক্রীতদাস সংগ্রহ করে। এই লুণ্ঠিত অর্থ ও ক্রীতদাস মিশরের সম্রাট ও দাসপ্রভু এবং পুরোহিতদের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। মিশরে ক্রীতদাসের সংখ্যা বহু গুণে বেড়ে যায়। পুরোহিতদের ক্ষমতা বিশেষ ভাবে বেড়ে যায়। মিশরের প্রধান মন্দিরের পুরোহিতের ক্রীতদাসের সংখ্যাই ছিল প্রায় আট লক্ষ। অর্থাৎ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক থেকে প্রধান পুরোহিত সম্রাটের প্রায় সমান ছিলেন।



ধাতু গলিয়ে তৈরী-করা কুড়াল ও কুড়ালের ছাঁচ

সমাজের ধনী-দরিদ্রের মধ্যেকার পার্থক্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মিশরীয় সম্রাট, অভিজাত ও পুরোহিতদের শোষণে কৃষক এবং ক্রীতদাসদের জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে। এর ফলে মিশরে ঐ সময়ে ঘন ঘন কৃষক অভ্যুত্থান এবং দাস-বিদ্রোহ দেখা দিতে থাকে। এই সব গৃহবিবাদের ফলে মিশর তার বাইরের সকল জাঁকজমক সত্ত্বেও ভেতরে ভেতরে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অধীনস্থ দেশ গুলোতে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিল। এই সব ঘটনার ফলে মিশর অত্যন্ত হীনবল হয়ে পড়ে এবং এই রকম পরিস্থিতিতে খৃষ্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে পারস্যের সম্রাট মিশর আক্রমণ করেন ও সমগ্র মিশর দখল করে নেন।

তিন ॥ পারস্যের রাজশক্তির উদয় ও ক্ষমতা-বিস্তার

আধুনিক কালের ইরাণ দেশের প্রাচীন নাম হচ্ছে পারস্য। মিশর ও মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতা যখন নিজেদের উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেছে তখন পারস্যে তার চেয়ে অধিকতর অগ্রসর

একটি শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। এরা প্রাচীন আর্য জাতির একটি শাখা। পারস্যে বসতি স্থাপনের অল্পকালের মধ্যে আর্যরা সেখানে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন। এদের সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা, উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লোহার ব্যাপক ব্যবহারের জন্য পারস্যের শক্তির সামনে মেসোপোটেমিয়া ও মিশর দ্রুত পরাজয় বরণ করে।

পারস্যের অধিবাসীরা আর্য বংশের লোক। মধ্য এশিয়ার আদি বাসস্থান ত্যাগ করে এরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের একটি শাখা পারস্যে এসে বসবাস করেন ও অন্য একটি শাখা ভারতে এসে বসতি স্থাপন করেন। এই বিবরণ কতখানি গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে নানা মত রয়েছে—কিন্তু এই আশ্রয়-সন্ধানী আর্যরা যে এক উন্নত সভ্যসমাজের লোক তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং তারই জন্য অত্যন্ত দ্রুত পারস্যে এক অশেষ শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলা এঁদের পক্ষে সম্ভব হয়।

পারস্যে বসবাসকারী আর্যদের প্রধান নেতা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন জরাথুস্ত্র বা জারোআস্তার। তাঁর প্রচারিত ধর্মমত খুবই পরিচিত। তাঁর অনুগামীরা অগ্নি-উপাসক এবং এঁদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'জিন্দাবেস্তা'। এঁরা জগতে শুভ ও অশুভ এই দু'টি শক্তির দ্বন্দ্বে বিশ্বাসী। **আহুরা মাজদা** হচ্ছেন আলো ও শুভের দেবতা এবং **আরিমান** হচ্ছেন অন্ধকার এবং অশুভের শক্তি। পারসিকরা কৃষিকার্য ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। পারসিকরা এত দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠেন যে ৫২৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে সমগ্র মিশর তাঁদের করতলগত হয়। সম্রাট দারিউস-এর রাজত্বকালে পারস্য এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। গ্রীস ও রোম ছাড়া সমগ্র মিশর, উত্তরপশ্চিম ভারত, মধ্যএশিয়ার ও ইউরোপের বিরাট অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

এই বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের পর পারস্য সম্রাট দারিউস গ্রীস-

দেশে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে লিপ্ত হন। খৃষ্টপূর্ব ৪৯২ অব্দে সম্রাট দারিউস তাঁর জামাতা মারদোনিয়াস-এর নেতৃত্বে এক বিশাল নৌবাহিনীকে গ্রীসদেশ জয় করার জন্য পাঠান। সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে পড়ে পারস্যের নৌবাহিনী প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং গ্রীসদেশ জয়ের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

গ্রীসের প্রায় সকল জনপদগুলো একে একে পারস্য সম্রাটের ভয়ে অধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু দুটি শক্তিশালী গ্রীক রাজ্য এথেন্স ও স্পার্টা দারিউস-এর অধীনতা স্বীকার করতে রাজী হল না। প্রথমে এথেন্স জয় করার জন্য ৪৯০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে দারিউস এক বিশাল নৌবাহিনী সহ নিজে যুদ্ধযাত্রা করেন। পাঁচশ বিরাট বিরাট নৌকোয় করে ইজিয়ান সাগর অতিক্রম করে সম্রাট দারিউস সসৈন্যে মারাথন অঞ্চলে পৌঁছেন। মারাথন থেকে এথেন্স-এর দূরত্ব ছিল মাত্র ছাব্বিশ মাইল। পারস্যের বাহিনী আসছে খবর পেয়ে এথেন্স-এর বাহিনী স্পার্টার কাছে দূত পাঠায় কিন্তু স্পার্টার বাহিনীর আসতে দেরী হবে জেনে এথেনীয় বাহিনী একাই অভিজ্ঞ সেনাপতি মিলতিআদিস-এর নেতৃত্বে সর্বশক্তি নিয়ে মারাথনের রণক্ষেত্রে বিশাল পারসিক বাহিনীর সম্মুখীন হয়। প্রায় দশ হাজার এথেনীয় সৈন্য পঁচিশ হাজারের মতো পারসিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মারাথনের এই যুদ্ধে বিশাল পারসিক বাহিনীর নিদারুণ পরাজয় ঘটে। প্রায় ছয় হাজার পারস্য সৈন্য নিহত হয় কিন্তু এথেনীয় বাহিনীর মৃত্যুর সংখ্যা ছিল মাত্র দু'শর মতো! প্রাচীন গ্রীসের যুদ্ধের ইতিহাসে এই অমর যুদ্ধের কথা গৌরবের সঙ্গে উল্লিখিত হয়।

মারাথন-এর এই যুদ্ধের সঙ্গে গ্রীকদের বিখ্যাত দৌড়বীর ফিদিপ্পাইদিস-এর নাম যুক্ত হয়ে রয়েছে। তিনিই এথেন্স-এর দূত হিসাবে ১৫০ মাইল দূরে স্পার্টায় দৌড়ে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসেছিলেন; আর মারাথনের যুদ্ধজয়ের সংবাদ রণক্ষেত্র থেকে

তিনিই ২৬ মাইল দূরে এথেন্সে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। এই দীর্ঘপথ দৌড়ানোর ফলে এথেন্সে যুদ্ধজয়ের সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই বিখ্যাত দৌড়বীরের স্মৃতিতে অলিম্পিক খেলাধূলার দীর্ঘ-দৌড় প্রতিযোগিতা 'মারাথন দৌড়' নামে আজো পরিচিত।

ম্যারাথন দৌড়ের ইতিহাস

দারিউসের পক্ষে এথেন্স জয় করা সম্ভব হয়নি। বিরাট প্রস্তুতির কাজ শেষ করার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জেরেকসেস গ্রীস দেশ জয়ের জন্য প্রস্তুত হন এবং ৪৮০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে গ্রীস দেশ অভিমুখে বিপুল বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। এই সময়ের যুদ্ধের ঘটনাবলীর বর্ণনা হিরোদোতাস নামক একজন গ্রীক ঐতিহাসিক লিখে গেছেন। পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন বলে তাকে "ইতিহাসের-জনক" বলা হয়। কোনো যুগের ঘটনার বিবরণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখাই ইতিহাস-লেখকের কাজ। এই হিসাবে হিরোদোতাস নিশ্চিত-ভাবেই এই সম্মানের অধিকারী। জেরেকসেস তাঁর বিশাল বাহিনীকে সমুদ্র পার করার জন্য দার্দানেলিস প্রণালীতে অসংখ্য নৌকো জমায়েত করে নৌকো দিয়ে ভাসমান সেতু রচনার আয়োজন করেন। বিশাল সৈন্য বাহিনীর পাশাপাশি পারসিক নৌ-বাহিনীও যুদ্ধ-অভিযানে লিপ্ত হয়। এই অভিযানের আয়োজনও সামদ্রিক ঝড়ে বিপর্যস্ত হয় এবং থার্মোপলির সংকীর্ণ গিরিপথে বিশাল পারসিক স্থল-বাহিনী স্পার্টার রাজা ও দক্ষ সেনাপতি


'ইতিহাসের-জনক'
হিরোদোতাস

লিওনিদাস-এর নেতৃত্বাধীন ক্ষুদ্র অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটি গ্রীক বাহিনীর সম্মুখীন হয়। একজন বিশ্বাসঘাতক পারস্য বাহিনীকে গিরিপথকে পাশ কাটিয়ে লিওনিদাস-এর বাহিনীকে ঘেরাও করার গোপন পথের কথা জানিয়ে দেয়। ফলে তিনশ' মরণজয়ী স্পার্টান সৈন্য নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং ধ্বংস হয়ে যান। সমস্ত এথেন্সবাসীরা নগর পরিত্যাগ করে চলে যান এবং গ্রীক যুদ্ধ জাহাজগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পারস্য বাহিনী এথেন্সকে নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু নৌ যুদ্ধে থেমিস্টোক্লিসের সুচতুর নেতৃত্বে বিশাল পারসিক নৌ-বাহিনী ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়।



থার্মোপলির যুদ্ধের বীর-নায়ক লিওনিদাস

জেরেকসেস-এর বাহিনীর পক্ষেও গ্রীস দেশ পুরো জয় করা সম্ভব হয় নি। এথেন্স ও স্পার্টার গৃহবিবাদের ও পেলপোনেসিয়ান যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে পারস্য স্পার্টাকে সাহায্য করে। দীর্ঘকাল ব্যাপী এই যুদ্ধে এথেন্স-এর গৌরবের যুগ শেষ হয় কিন্তু স্পার্টান বাহিনী বিজয়ী হলেও দুর্বল হয়ে পড়ে। গ্রীসের জীবনে তখন দারুণ দুর্দিন। গ্রীক রাষ্ট্রগুলোর এই অনৈক্যের যুগে ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ সমগ্র গ্রীস দেশকে ঐকবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলেন। তাঁর পুত্র দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্দার পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারিউসকে ৩৩১ খৃষ্টপূর্বাব্দে আরবেলার যুদ্ধে পরাস্ত করে পারস্যের হাতে গ্রীকদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

চার ॥ মোজেস-এর নেতৃত্বে ইহুদিদের মুক্তি-অভিযান

খৃষ্টের জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগে ইউফ্রেতিস নদীর মোহনার কাছাকাছি অঞ্চলে বসবাসকারী একটি ক্ষুদ্র মেষ-পালক সম্প্রদায় হিব্রু বা ইহুদি নামে পরিচিত ছিল। হিব্রুদের ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেল' থেকে জানা যায় ইহুদিদের প্রধান আব্রাহাম ব্যাবিলনে হামবুরাবির রাজত্বকালে তাঁদের মেষ পালের চারণ-ভূমির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে মিশরে এসে উপস্থিত হন।

প্রায় পাঁচশ বছর ইহুদিগণ মিশরে বসবাস করেন। কিন্তু তার পর মিশরে বসবাস করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। ঐ সময়ে মিশরে যাযাবরদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহুদিরা এই আক্রমণকারীদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। আক্রমণকারী যাযাবরগণ বিতাড়িত হওয়ার পর মিশরীয় দাস-প্রভুরা ইহুদিদের জোর করে ক্রীতদাসে পরিণত করেন এবং ইহুদিদের জীবন একেবারে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

এই রকম কঠিন অবস্থার মধ্যে ইহুদিদের নেতা ছিলেন মোজেস। তাঁর সহজ সরল জীবন যাত্রা এবং প্রেরণাদায়ক নেতৃত্ব ইহুদিদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করে। মিশরীয় সেনা-বাহিনীর কঠোর বাধা-নিষেধ অতিক্রম করে মোজেস ইহুদিদের নিয়ে মরুভূমি ও নীলনদ পার হয়ে সদলবলে পালেস্টাইনে উপস্থিত হন। দাসত্বের বন্ধন থেকে এটা ছিল ইহুদিদের এক প্রেরণাদায়ক মুক্তি-অভিযান। খৃষ্টের জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর আগে এই অভিযান-কালে মোজেস ইহুদিদের মহামান্য নেতা ও ধর্মগুরু হিসাবে স্বীকৃত হন। ইহুদিগণ শুধু যে দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করলেন তাই নয়, এই অভিযানের মধ্য দিয়ে ইহুদিদের ধর্মমত একটি স্পষ্ট রূপ লাভ করল। তাঁরা একজন ঈশ্বর বা যিহোভাকেই আরাধনা করার শিক্ষা মোজেস-এর কাছ থেকে লাভ করলেন।

মোজেস তাঁদেরকে 'দশটি সুনীতির' কথা বললেন। এই দশটি সুনীতি বা 'টেন কমাণ্ডমেণ্টস্' ইহুদিদের ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের পথপ্রদর্শক নীতি হয়ে উঠল।

ইহুদিগণ যখন প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হলেন তখন ওখানে কানানাইট সম্প্রদায়ের লোকজনেরা বসবাস করছিলেন। ইহুদিগণ ধীরে ধীরে কানানাইটদের হটিয়ে দিয়ে প্যালেস্টাইন অঞ্চল পুরোপুরি দখল করে নেন। তাঁদের প্রধান কেন্দ্র ছিল জেরুজালেম অর্থাৎ 'শান্তির আবাস' নামক একটি নূতন শহর। ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই মোজেস-এর মৃত্যু হয়। কিন্তু একটি সুসংগঠিত সম্প্রদায় হিসাবে ইহুদিদের একটি নিজস্ব বাসভূমি তখন প্যালেস্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে ইহুদি সম্প্রদায় জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলেন। তাঁদের প্রথম রাজা ছিলেন সল। তিনি একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন এবং একটি বড় সৈন্যদল গড়ে তুলেছিলেন। রাজা হয়েও তিনি তাঁর প্রজাদের মতো সরল জীবন যাপন করতেন এবং তাঁবুতে বসবাস করতেন। সলের পর রাজা হন ডেভিড। তিনিও একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। তিনি জোর করে কানানাইটদের দুর্গ দখল করে নেন এবং তাঁর রাজধানী জেরুজালেমকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেন। ইহুদিদের নিজ ভাষা হিব্রুতে লেখা বাইবেল থেকে ইহুদিদের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়; তাঁদের রীতিনীতি এবং ভালো-মন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে অভিমত তা থেকে জানা যায়। 'বাইবেল'-এর ওল্ড টেস্টামেণ্টের বহু ধর্ম-সঙ্গীত রাজা ডেভিড-এর রচনা বলে মনে করা হয়।

ডেভিড-এর মৃত্যুর পর ইহুদিদের রাজা হন সলোমন। তিনি ইতিহাসে 'জ্ঞানী সলোমন' বলে পরিচিত। তাঁর শাসনের সময় জেরুজালেম ও প্যালেস্টাইনের বিরাট সমৃদ্ধি ঘটে। সলোমন জাঁক-

জমকের পক্ষপাতী ছিলেন; বিরাট বিরাট রাজপ্রাসাদ নির্মাণ এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেন। সলোমনের মৃত্যুর পর প্যালেস্টাইনের উত্তর অঞ্চলে ইজরায়েল নামে একটি নতুন রাজ্য স্থাপিত হয় এবং ইহুদি রাজ্য দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইহুদিগণের ঐক্য সাময়িক ভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এই অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করে আসিরীয় রাজারা প্যালেস্টাইন দখল করে নেওয়ার জন্য আক্রমণ শুরু করেন। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে চলে। ৫৮৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সমগ্র প্যালেস্টানেই ব্যাবিলনের রাজাদের শাসন কায়েম হয় এবং জেরুজালেম নগর ধ্বংস হয়ে যায়। এই পরাজয় ও নূতন দাসত্বের ফলে ইহুদিদের মধ্যে ঐক্যের মনোভাব আবার ফিরে আসে এবং তাঁরা আবার ঐক্যবদ্ধ একটি জাতিতে পরিণত হন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রীস দেশের সভ্যতা

গ্রীস দেশকে পাশ্চাত্য-সভ্যতার জন্মভূমি বলা হয়। একমাত্র খৃষ্টধর্ম ছাড়া ইউরোপের সভ্যতার যা কিছু গর্বের ও গৌরবের তার সবকিছুর মূলেই গ্রীক-জাতির অবদান রয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, গণিত, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলা, কাব্য, নাটক, সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতি জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই গ্রীক জাতির দানে সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে।

গ্রীসের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। গ্রীস ইউরোপের বলকান উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সমুদ্রের কোল ঘেষে অবস্থিত একটি পর্বতময় দেশ। গ্রীসদেশের তিনদিকেই সাগর, দেশের মধ্যেও বহু নদনদী রয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে সমুদ্র বহুদূর ছড়িয়ে

রয়েছে। এভাবে সমুদ্র-বেষ্টিত থাকার জন্য গ্রীসের অধিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই নৌবিদ্যায় সুদক্ষ। দেশটি পর্বতময় বলে একই দেশের নানা অঞ্চল প্রায়-বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র জীবনধারা



গড়ে তুলতে পেরেছে। খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের ঐক্য ও বিরোধের ইতিহাসই প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস।


ক্রীটের সভ্যতার নিদর্শন

গ্রীস দেশের অধিবাসীরা আর্য বংশের লোক। খৃষ্টের জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর আগে তারা গ্রীসে আসেন এবং ক্রমে ক্রমে গ্রীসের আদিম অধিবাসীদের বিতাড়িত করে খৃষ্ট-পূর্ব ১২০০ অব্দের মধ্যে সমগ্র দেশ তারা অধিকার করে নেন। তার অনেক আগেই ক্রীট দ্বীপে প্রাচীন ও উন্নত একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই নূতন ও পুরাতন অধিবাসীদের মিলনের মধ্যদিয়েই নূতন গ্রীক জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

ইজিয়ান সাগরের ক্রীট দ্বীপে বহু প্রাচীনকালেই একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সমুদ্র-বেষ্টিত দ্বীপবাসী হিসাবে ক্রীটের অধিবাসীরা ছিলেন সুদক্ষ নাবিক এবং ব্যবসায়ী। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী শহরগুলোর সঙ্গে তারা বাণিজ্য করতেন এবং নানাদেশে

যাতায়াতের ফলে তারা প্রচুর অভিজ্ঞতা ও সম্পদ সংগ্রহ করেন। ক্রীটের হস্তশিল্প ছিল সুবিখ্যাত। নানারকম চিত্রবিচিত্র করা পাত্র নির্মাণে ক্রীটের সুনাম ছিল। খৃষ্টের জন্মের হাজার হাজার বছর আগে ক্রীটে সভ্য জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ইজিয়ান সাগরের তীরবর্তী সকল অঞ্চলেই ক্রীটের সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। খৃষ্টের জন্মের ৩৪০০ থেকে ১৪০০ অব্দের মধ্যে ক্রীট দ্বীপে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ক্রীটের প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেলেও তার প্রভাবে গ্রীসের সভ্যতার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৮০০ বছর আগে গ্রীক মহাকবি হোমার 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' নামে দু'খানি মহাকাব্য রচনা করেন।

মহাকবি হোমার-এর 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'

জনশ্রুতি হচ্ছে হোমার নাকি ছিলেন অন্ধ। এই অন্ধ মহাকবি গ্রীক সমাজের চমৎকার জীবন্ত চিত্র তাঁর মহাকাব্যে অঙ্কন করে রেখে গেছেন। আমাদের দেশের 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতের' মতোই এই দু'খানি মহাকাব্য যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষ সমান আগ্রহ নিয়ে পড়ে আসছেন।

গ্রীস দেশে দীর্ঘকাল ধরে চারণ-কবিদের মুখে মুখে প্রচারিত বীরদের নানা কাহিনীকে ভিত্তি করেই এই মহাকাব্য দুটি রচিত হয়েছে। ট্রয়ের রাজা কর্তৃক স্পার্টার রাণী হেলেনের অপহরণের প্রতিবাদে ট্রয়ের বিরুদ্ধে গ্রীক-বাহিনীর অভিযানের ও হেলেনকে শেষপর্যন্ত উদ্ধারের কাহিনীই 'ইলিয়াডে' বর্ণিত হয়েছে।

মহাকাব্য 'ওডিসি'-র বিষয়বস্তু হচ্ছে ট্রয়-জয়ী বীর ওডিসিউস বা ইউলিসিস-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং অসংখ্য বিঘ্ন-বিপদ জয় করে ঘরে-ফেরার কাহিনী।

মহাকবি হোমারের মহাকাব্য থেকে প্রাচীন যুগের গ্রীক সমাজের নানা দিক সম্পর্কে বহু তথ্য আমরা জানতে পারি।

গ্রীসদেশ ঐ সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এক একটি প্রধান নগরকে কেন্দ্র করে এই রাজ্য গুলো গড়ে উঠেছিল। এই সবগুলো রাজ্যই রাজাদের শাসনাধীন ছিল। রাজা একাধারে শাসক, সেনাপতি ও বিচারক ছিলেন। রাজারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজারা রাজ্যশাসন করতেন। রাজা অভিজাতদের সঙ্গে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত নিতেন তা নাগরিকদের সভায় অনুমোদন করে নেওয়া হত।

হোমারের মহাকাব্যে প্রাচীন গ্রীসের সামাজ-চিত্র

অভিজাত শ্রেণী, স্বাধীন নাগরিক, শ্রমজীবী ও ক্রীতদাস এই চারটি শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত ছিল। অভিজাত শ্রেণীই সম্পত্তির মালিক ছিলেন এবং সকল সুখ-সুবিধা ভোগ করতেন। স্বাধীন নাগরিকগণের নাগরিক অধিকার ছিল কিন্তু ভূসম্পত্তি তাদের অতি অল্পই ছিল; এরা নিজেরাই নিজেদের চাষবাস করতেন। শ্রমজীবীদের কোনো নাগরিক অধিকার ও সম্পত্তি ছিল না। ক্রীতদাসদের কোনো অধিকার ছিল না, সম্পত্তি ছিল না; তারা প্রভুদের জন্য কাজ করতে বাধ্য ছিলেন। প্রাচীন গ্রীসে দাসদের ক্রয়-বিক্রয় ছিল একটি লাভজনক ব্যবসা। দাসেরা সকল শ্রমসাধ্য কাজ করতেন। রাজায় রাজায় ও অভিজাতগণের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত। কৃষিকার্য ও পশুপালনই ছিল সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের প্রধান উপায়।



গ্রীসের ক্রীতদাস

হোমারের মহাকাব্যে দেখা যায় গ্রীকরা বহু দেবদেবীর পূজা করতেন। প্রত্যেক শহরেরই এক একজন অধিষ্ঠাতা দেব-দেবী আছেন বলে তারা বিশ্বাস করতেন। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে

তারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন। সমাজে পুরোহিতদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। পুরোহিতগণ দেবতা গণের পূজা করে তাদের সন্তুষ্ট রাখতেন। দেবদেবীরা অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং অমর এটা গ্রীকরা বিশ্বাস করতেন। দেবতারা অলিম্পিয়া পাহাড়ে বসবাস করেন বলে তারা বিশ্বাস করতেন। দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো বড় কাজে গ্রীকরা লিপ্ত হতেন না। পুরোহিতগণ দেবতাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করতেন।

মহাকাব্যে বর্ণিত এই সরল জীবন-যাত্রা গ্রীসদেশে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় এবং বিভিন্ন সমৃদ্ধ নগরকে কেন্দ্র করে এক ধরনের নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠে। ঐ নগর-রাজ্যগুলো গ্রীসদেশের এক উল্লেখযোগ্য দিক। এই নগর রাষ্ট্রগুলোতে অভিজাতদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শাসনকার্য ধনী অভিজাতদের দ্বারা পরিচালিত হত বলে সাধারণ নাগরিকগণ অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই ধীরে ধীরে অধিকাংশ নগর রাষ্ট্রগুলোতেই গণতন্ত্র অর্থাৎ ডিমোক্রেসি প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রীক ভাষায় 'ডিমস্' কথার অর্থ হচ্ছে 'জনগণ' এবং 'ক্রেসি' কথার অর্থ হচ্ছে শাসন। জনগণের শাসনকে বলা হয় গণতন্ত্র বা ডিমোক্রেসি। এই গণতন্ত্র ছিল শুধু 'নাগরিকদের' গণতন্ত্র; গ্রীসের ব্যাপক সংখ্যক ক্রীতদাসদের কোনো অধিকার স্বীকার করা হয়নি। আসলে গ্রীসে তখন দাস-সমাজই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্র

স্পার্টা গণতন্ত্র গ্রহণ করেনি। তারা এক ধরনের রাজতন্ত্র অনুসরণ করে। অন্যদিকে এথেন্স গণতন্ত্রের পথ গ্রহণ করে। এথেন্স ও স্পার্টার এই ভিন্ন ভিন্ন শাসন পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে এই দুটি প্রধান গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে একটি তীব্র প্রতিযোগিতার মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

এথেন্স ও স্পার্টার ভিন্নমুখী দু'টি জীবন ধারার মধ্যদিয়ে গ্রীস দেশের দুটি বিপরীত চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে এবং গ্রীসের পরবর্তী

ইতিহাসে তা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। ঠিক এর পাশাপাশি আরেকটি ঘটনা গ্রীকজাতির জীবনকে খুবই প্রভাবিত করে।

এথেন্স ও স্পার্টার বিপরীত জীবনধারা

প্রাচীন কাল থেকেই গ্রীসদেশবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বেঁচে থাকার জন্য সচেষ্ট হন। লোক সংখ্যার তুলনায় গ্রীসে কৃষিজমি ছিল খুবই কম। তাই ভূমধ্য সাগরের তীর-ভূমি জুড়ে গ্রীক বণিকদের বিস্তৃত উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। গ্রীকরা অন্যান্য রাজ্যের ও অঞ্চলের ভেতরে প্রবেশ করতেন না এবং সমুদ্র তীরবর্তী

গ্রীক উপনিবেশগুলোর গুরুত্ব

সুপ্রাচীন শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতেই বসবাস করতেন। গ্রীকরা নিজ দেশে বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও এই উপনিবেশগুলোতে গ্রীসদেশের নানা অঞ্চলের লোকেরাই একত্রিত হতেন ; এতে গ্রীসের জাতীয় ঐক্যবোধ বৃদ্ধি পায়। গ্রীস দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির এটা একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু সমগ্র গ্রীক সভ্যতাই ছিল দাস-সমাজ ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজের ক্ষুদ্র একটি অভিজাত অংশই সকল সুবিধা উপভোগ করতেন তাই দাসগণ ছাড়াও গরীব স্বাধীন-নাগরিকদের মধ্যেও নানা অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অসন্তোষ দূর করার জন্যই এথেন্স-এর নগর-রাষ্ট্র গুলোতে গণতন্ত্রের প্রবর্তন করা হয়। নাগরিক ও দাস এই দুভাগে সমাজকে ভাগ করে সমাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। অভিজাতদের শাসনের ত্রুটিগুলোকে দূর করার জন্য খৃঃ পূঃ ৫৯৪ অব্দে সোলন-এর নেতৃত্বে নানাবিধ অর্থনৈতিক ও ও সামাজিক সংস্কার চালু করা হয়। সোলন ঋণ গ্রহণের আইনের সংস্কার করেন। তিনি সমস্ত বকেয়া ঋণ বাতিল করে দিয়ে আইন পাশ করেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারেরও তিনি আয়োজন করেন। খেলাধূলা, শরীর-চর্চা ও সঙ্গীত-চর্চাকে তিনি উৎসাহিত করেন। সোলনের প্রবর্তিত এই গণতান্ত্রিক সংস্কারের

ফলে এথেনীয় সভ্যতার খুবই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু সোলনের সংস্কারের ফলে ধনী আভজাতরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং এথেন্সে তারা অভিজাত শ্রেণীর স্বৈরতন্ত্রী শাসন আবার কায়েম করতে সচেষ্ট হন। এর ফলে এথেন্সে সব সময় নানা রকম ঝগড়া, বিবাদ ও সংঘর্ষ লেগেই থাকত।

এথেন্সের গণতান্ত্রিক সংস্কারের এই পরিণতি দেখে স্পার্টার নেতাদের মনে গণতন্ত্র সম্পর্কে বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। এথেন্সে সোলন যে গণতান্ত্রিক সংস্কার করেছিলেন স্পাটায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত সংস্কার প্রবর্তন করেন **লাইকারগাস**। লাইকারগাসের সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি শক্তিশালা শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে স্পার্টার পক্ষে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ দমন করা ও অধিকৃত উপনিবেশগুলোকে কঠোর ভাবে দমন করে রাখা সম্ভব হয় এবং সামরিক দিক থেকে স্পাটাকে অপরাজেয় করে তোলা যায়। রাষ্ট্রে ও সমাজে কঠোর শৃঙ্খলা কায়েম করা এবং সারা দেশকে একটি সামরিক শিবিরে পরিণত করাই ছিল লাইকারগাসের উদ্দেশ্য। যুদ্ধবিদ্যা ও শরীরচর্চা ছাড়া অন্য কোনো রকম বিদ্যাচর্চার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হত না। কাব্য, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলার অধ্যয়ন বাতিল করে দেওয়া হয়। নাগরিকদের কোনো ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকার করা হত না। একমাত্র সুস্থ শিশুকেই বাঁচতে দেওয়া হত। শিশুকাল থেকে সুস্থদেহে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করে তোলা হয়।

এক কথায় এথেন্সে সোলনের ও স্পাটায় লাইকারগাসের প্রবর্তিত সংস্কার ছিল একেবারে পরস্পর-বিরোধী। সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এথেনীয় সভ্যতা জগতে বিরাট কীর্তি রেখে গেছে; শিল্প, সাহিত্য, দর্শন সকল ক্ষেত্রেই তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু শুধু সামরিক শক্তির আরাধনা করার ফলে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সামরিক সাফল্য লাভ করলেও স্পার্টা ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখে যেতে

ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রেও স্পার্টার পক্ষে দূরদর্শী নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। এথেন্স ও স্পার্টার এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোকেই দুর্বল করে তুলে এবং গ্রীসে ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপের এবং তার সুবিখ্যাত পুত্র দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোর সমৃদ্ধির যুগে পারস্য-সম্রাটগণ গ্রীস জয়ের জন্য পর পর অনেকগুলো যুদ্ধ অভিযান চালান। এই সময়ে পারস্য-সাম্রাজ্য সিন্ধু নদ থেকে দার্দানেলিস এবং মিশর থেকে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গ্রীস জয় করতে পারলে ইউরোপে পারস্য-সাম্রাজ্য বিস্তার করা সম্ভব হবে বলে পারস্যের সম্রাটেরা মনে করেছিলেন। পারস্যের আক্রমণের বিপদ দেখা দেওয়ায় এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পারস্যের তিন তিনটি বিরাট যুদ্ধ অভিযান পরাজিত হয়। গ্রীকদের হাতে বিশাল পারস্য-বাহিনীর এই পরাজয়ের ফলে গ্রীস এবং ইউরোপ পারস্যের পরাধীনতার কবল থেকে রক্ষা পায়। পারস্য সাম্রাজ্যের কথা আলোচনার সময় এই যুদ্ধগুলোর কথা আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।



পেরিক্লিস

এথেনীয় সভ্যতার এই গৌরবময় যুগে পেরিক্লিস নামক একজন এথেনীয় রাষ্ট্রনেতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ বছর আগে এথেন্স খুবই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং নৌ-শক্তিতে অপরাজেয় হয়ে ওঠে। ৪৪৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে পেরিক্লিস এথেন্স-এর রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন। পেরিক্লিসের নেতৃত্বাধীনে গ্রীসের

অধিকাংশ নগররাষ্ট্রই ঐক্যবদ্ধ হয়। স্বাধীন নাগরিকদের অধিকাংশই পেরিক্লিসকে সমর্থন করতেন এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ পনর বছর পেরিক্লিস এথেন্স রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। সুশৃঙ্খল সুশাসনের জন্য এই সময়ে এথেন্স-এর নেতৃত্বাধীন গ্রীক রাষ্ট্র সমূহের বিশেষ সমৃদ্ধ হয়। 'কনফেডারেসি অফ ডেলস' বা গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলোর মিলিত সঙ্ঘে এথেন্সের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

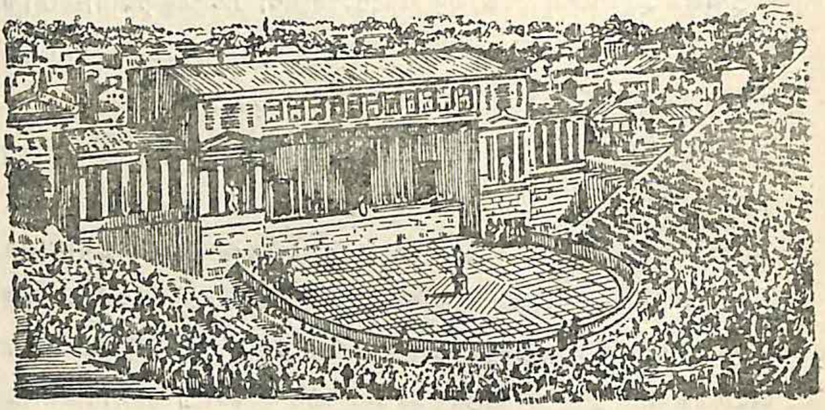
এই সময়ে গ্রীসের ইতিহাসে বহু স্বনামধন্য ব্যক্তির জন্ম হয়। পেরিক্লিস নিজে গ্রীসের ইতিহাসে সুবক্তা, সুশাসক এবং গণতন্ত্রের পূজারী বলে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। তার সুশাসনের ফলে বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক এবং সামরিক দিক থেকে গ্রীসদেশের প্রচুর উন্নতি হয়। নাগরিকদের পক্ষে রাষ্ট্র-শাসনের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করা সহজ ও সম্ভব হয়। ফলে গণতান্ত্রিক জীবন-ধারা খুবই জনপ্রিয় হয় এবং এথেন্সের ঐক্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ইতিহাস, সাহিত্য, নাটক, কাব্য ও দর্শনের নানা ক্ষেত্রে গ্রীসের অবদান এই সময়ে চিরস্মরণীয় হয়ে ওঠে।

'ইতিহাসের-জনক' হিরোদোতাস

পারস্য সম্রাটদের গ্রীস দেশ আক্রমণের সময় হিরোদোতাস এই যুদ্ধের কাহিনীগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তার রচিত এই যুদ্ধ কাহিনী পৃথিবীর প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। তাই হিরোদোতাস 'ইতিহাসের জনক' অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইতিহাস-লেখক হিসাবে পরিচিত।

গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এথেন্সে নাটক, কাব্য ও সাহিত্য-চর্চার খুবই উন্নতি হয়। গ্রীকরা নাটক ও থিয়েটার দেখতে খুবই ভাল বাসতেন। এথেন্সে ও গ্রীস দেশে বহু প্রাচীন থিয়েটার হল নির্মিত হয়েছিল। হাজার হাজার লোক একসঙ্গে বসে এই অভিনয় দেখতে পারতেন। ঐ সময়ের নাট্যকার সফোক্লিস ছিলেন খুবই বিখ্যাত। সফোক্লিস, আরিস্টোফেনিস, এসকাইলাস, ইউরিপিদিস

প্রমুখ গ্রীক নাট্যকারদের রচনা আজো পৃথিবীর নানা দেশে অভিনীত হয়। সাধারণভাবে নাটকগুলো 'বিয়োগান্তক' ও 'মিলনান্তক' এই দুই ধরনের ছিল। ইতিহাসের ঘটনা ও দেবদেবীদের কাহিনী



গ্রীক থিয়েটার

নিয়েই এই নাটকগুলো লিখিত হত। নাটকের মেজাজ অনুযায়ী নানা রকম মুখোস পরে অভিনেতারা অভিনয় করতেন। নাটকে



থিয়েটারে ব্যবহৃত মুখোস

ব্যবহৃত নানা ধরনের প্রাচীন মুখোস গ্রীস দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। অভিনয়ের পর নাট্যকারদের পুরস্কৃত করার নিয়ম প্রচলিত ছিল।

শুধু সাহিত্য, নাটক ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেই নয় বিভিন্ন দার্শনিক রচনার জন্যও এই সময়ের গ্রীস দেশ সুপরিচিত। 'ইতিহাসের জনক' হিসাবে যেমন হিরোদোতাস পরিচিত পৃথিবীর, প্রথম দার্শনিক হিসাবে গ্রীক পণ্ডিত থেলিস-এর নামও জগতে বিখ্যাত। এথেন্স-এর স্বর্ণ-যুগে সক্রেটিস দার্শনিক হিসাবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তিনি প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্যকে খুঁজে বের করার একটি পদ্ধতি প্রচলিত করেন। তাঁর চিন্তাধারা গ্রীক তরুণদের মধ্যে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। সক্রেটিস-এর শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের মধ্যে দার্শনিক প্লেটোর নাম সুপরিচিত। প্লেটোর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন দার্শনিক পণ্ডিত আরিস্তোতল। সক্রেটিস, প্লেটো ও আরিস্তোতল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিন্তাবিদ হিসাবে আজো সর্বত্র সম্মানিত হয়ে থাকেন। সক্রেটিস এর বিচার-পদ্ধতি ও চিন্তাধারা গ্রীক শাসকেরা পছন্দ করতেন না এবং তারা ৩৯৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। নিজের হাতে বিষ পান করে মৃত্যুবরণ করে সক্রেটিস জগতে অমর হয়ে আছেন।

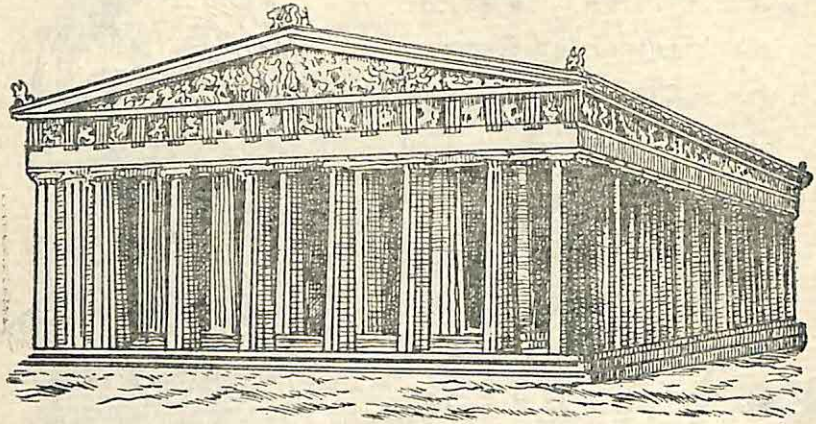


সক্রেটিস



প্রাচীন গ্রীসের পানপাত্র

এই সময়ে ভাস্কর্য ও শিল্পকর্মে গ্রীসদেশ অতুলনীয় সমৃদ্ধি লাভ করে। পারস্য-অভিযান কালে এথেন্স নগরী দুই দুইবার সম্পূর্ণ-



পার্থেনন

ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু গ্রীক ভাস্কর ও স্থপতিরা নূতন করে



ডিসকাস থ্রোয়ার

এথেন্স নগরীকে গড়ে তুলেন। পাথরের মূর্তি নির্মাণে ও চিত্র-বিদ্যায় প্রাচীন গ্রীস বিখ্যাত ছিল। গ্রীসের ভাস্কর্য ও শিল্পকলা আজো বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করে। মন্দির নির্মাণে গ্রীক জাতির কৃতিত্ব সুপরিচিত। এথেন্স নগরের দেবী এথেনার সম্মানে নির্মিত মন্দির 'পার্থেনন' বিশ্ব-বিখ্যাত। মন্দিরের গায়ে অঙ্কিত চিত্র প্রাচীন ইতিহাসের নানা সাক্ষ্য বহন করছে। খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ বছর আগে মাইরন ও গেমিস ছিলেন গ্রীক ভাস্করদের মধ্যে সুপরিচিত।

মাইরনের নির্মিত মার্বেল পাথরের ডিসকাস নিক্ষেপকারীর মূর্তি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য গুলোর অন্যতম বলে স্বীকৃত। অলিম্পিয়ার পাদদেশে নির্মিত গ্রীক দেবরাজের মন্দিরও একটি বিশ্ববিখ্যাত মন্দির। গ্রীকদের মধ্যে শরীর-চর্চা খুবই জনপ্রিয় ছিল। খেলাধূলার প্রতি গ্রীকদের আগ্রহ সুপরিচিত। দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য দেবদেবীদের বাসভূমি বলে পরিচিত অলিম্পিয়া পাহাড়ের পাদদেশে গ্রীকরা প্রতি চার বছর পর পর নানা প্রকার খেলা-ধূলার আয়োজন করতেন। খৃষ্টের জন্মের ৭৭৬ বছর আগে সর্বপ্রথম এই অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে যে 'বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া' অনুষ্ঠিত হয় তা এই প্রাচীন অলিম্পিক ক্রীড়ার সম্মানেই আয়োজিত হয়। গ্রীস দেশে অলিম্পিক ক্রীড়া এতই জনপ্রিয় ছিল যে এই খেলা ধূলার সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রেখেও তা অনুষ্ঠিত হত। এই শরীর-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসে নানা মানসিক উন্নতি-বিধায়ক শিল্পকলা, যেমন—কাব্য, সঙ্গীত ও নাটকের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। এর ফলে গ্রীক ভাষার প্রচুর উন্নতি হয় এবং প্রকৃত পক্ষেই গ্রীক-সভ্যতা ইউরোপের সভ্যতার ভিত্তি-স্বরূপ হয়ে ওঠে। সন্দেহ নেই, এথেন্স ছিল এই উন্নতির একেবারে সম্মুখ সারিতে। এথেন্স ও সমগ্র গ্রীস দেশে একটি যথার্থ স্বর্ণ-যুগেরই এইসময় সৃষ্টি হয়েছিল।



দৌড়বীর ছেলে দৌড়ানোর পর পায়ের নীচের কাঁটা তুলছে

A B Γ Δ E

গ্রীক হরফ

পারস্য সম্রাটদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর গ্রীসদেশে কিছু কালের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির একটি যুগ দেখা দেয়।

কিন্তু এই যুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এথেন্সের প্রভাব ও প্রতিপত্তি পাওয়ায় স্পার্টানরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এথেন্সের প্রভাব বৃদ্ধিতে অন্যান্য নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও নানা সন্দেহ দেখা দেয়। এর ফলে গ্রীস দেশে এক দীর্ঘস্থায়ী গৃহ-যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ আসলে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যেকার একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। ৪৩১ খৃষ্ট পূর্বাব্দে এই যুদ্ধ শুরু হয় এবং প্রায় ২৭ বছর ধরে এই গৃহ-যুদ্ধ চলে। দীর্ঘস্থায়ী এই যুদ্ধ পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র গ্রীসদেশ ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এথেন্সকে জব্দ করার জন্য স্পার্টা পারস্যের সম্রাটদের সাহায্য গ্রহণ করে। পারস্য এই সুযোগে এশিয়া-মাইনরের গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলো দখল করে নেয়। এই গৃহ-যুদ্ধের ফলে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলো খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ সমগ্র গ্রীস দেশে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন।



প্রাচীন গ্রীসে বিদ্যাচর্চা

- শিক্ষক ছাত্রের পড়া ধরছেন
- শিক্ষক ছাত্রের লেখা শুদ্ধ করে দিচ্ছেন
- সঙ্গীত শিক্ষার চিত্র

গ্রীসে মাসিডনের রাজত্ব

গৃহযুদ্ধে গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলো একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময়ে গ্রীসের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত মাসিডনের রাজা ফিলিপ

ধীরে ধীরে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলো দখল করে সমগ্র গ্রীসে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন। পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের বিবরণ লিখে রেখে গেছেন ঐ সময়ের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক **থুসিডাইডিস**। তাঁর রচনা থেকে এথেন্স ও স্পার্টাসহ গ্রীক নগর-রাজ্যগুলোর পতন এবং মাসিডন রাজ্যের ক্ষমতা বিস্তারের কথা জানা যায়।

গ্রীসের উত্তর অংশে অবস্থিত মাসিডন রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের সময় নিজেকে দূরে রেখেছিল এবং একটি সুশিক্ষিত সৈন্য বাহিনী গড়ে তুলেছিল। রাজা ফিলিপের নেতৃত্বে মাসিডনের ক্ষমতা ক্রমেই বিস্তার লাভ করতে থাকে। রাজা ফিলিপ বুঝেছিলেন জোর করে গ্রীসে রাজত্ব স্থাপন করলে তা স্থায়ী হবে না—তাই তিনি পারস্য-জয়ের জন্য গ্রীস দেশের সকল রাজ্যকে এক হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। তাঁর এই আহ্বানে দুর্বল নগর-রাজ্য গুলো সহজেই রাজী হল। পারস্যের অত্যাচারে ও অক্রমণে গ্রীসের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছিল তাই পারস্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান গ্রীসে বিপুল সাড়া জাগাল। ঐ সময়ে এথেন্সের একজন বিশিষ্ট জননেতা ও বক্তা **ডিমোস্থিনিস** মাসিডনের রাজা ফিলিপের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলে আসলে ফিলিপ গ্রীস দেশকে নিজের দখলে আনতে চান। এই ছিল ডিমোস্থিনিসের মূল অভিযোগ ; চতুর ফিলিপ সুকৌশলে এই অভিযোগ অস্বীকার করে ঐক্যের পক্ষে এথেন্সবাসীদের টেনে নিয়ে আসতে সমর্থ হন। শেষ পর্যন্ত এথেন্স সহ সমগ্র গ্রীস দেশেই ফিলিপের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩৩৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ফিলিপ যখন পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন সেই সময় একজন গুপ্ত-ঘাতকের হাতে ফিলিপের অকাল মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু কুড়ি বছরের রাজত্বকালে খণ্ড ছিন্ন গ্রীসকে ফিলিপ ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিলেন এবং গৃহযুদ্ধের ফলে দুর্বল গ্রীসকে তিনি একটি প্রবল শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করে তুলেছিলেন—

এটা ফিলিপের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। ফিলিপের এই সাফল্যকে ভিত্তি করেই তার দিগ্বিজয়ী পুত্র আলেকজান্দার এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

আলেকজান্দার

পিতার মৃত্যুর পর মাত্র কুড়ি বছর বয়সে আলেকজান্দার গ্রীস দেশের রাজা হন। রাজা ফিলিপ পুত্রের সুশিক্ষার সকল আয়োজনই সযত্নে করেছিলেন। ঐ সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক আরিস্তোতলকে তিনি পুত্রের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। ফিলিপ নিজে



আলেকজান্দার

পুত্রের যুদ্ধ-বিদ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এই চমৎকার সুযোগ পেয়ে অতি অল্প বয়সেই আলেকজান্দার জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং যুদ্ধ-

বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুশিক্ষিত হয়ে উঠেন। আলেকজান্দারের চরিত্রে বীরত্বের এবং অনেক সদগুণের যে প্রকাশ ঘটে তা ছিল এই সুশিক্ষারই ফল।



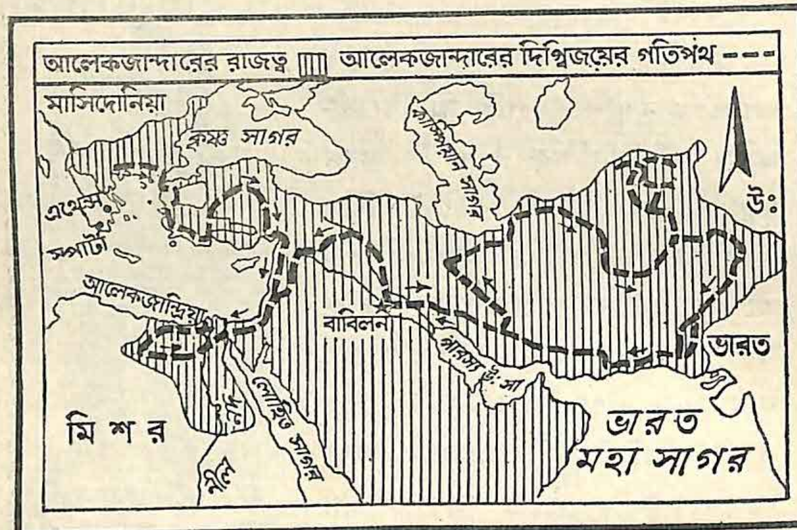
অ্যারিস্তোতল

সিংহাসনে আরোহণ করেই আলেকজান্দা পিতার পরিকল্পিত পারস্য-জয়ের অভিযান শুরু করেন। ৩৩৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বিশাল বাহিনী নিয়ে আলেকজান্দার পারস্য অভিযান শুরু করেন। প্রথমেই আলেকজান্দার একে একে পারস্যের অধিকৃত বন্দরগুলো জয় করে নেন। এর ফলে পেছন থেকে পারস্য বাহিনীর আক্রমণের আর কোনো উপায় রইল না। পারস্য ছিল ঐ সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী একটি রাজ্য। তাই আলেকজান্দার পারস্য বাহিনীকে পরাজয়ের জন্য অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করেন। সুদক্ষ নেতৃত্ব ও কৌশলের ফলে পারস্য সম্রাট তৃতীয় ডারিউস-এর সৈন্যবাহিনী ৩৩১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে আরবেলার যুদ্ধে চূড়ান্ত ভাবে পরাস্ত হয়।

পারস্য জয়ের পর বিজয়ী আলেকজান্দার মিশরে প্রবেশ করেন এবং ঐ দেশটি জয় করেন। নীলনদের মোহনায় নিজের নাম অনুসারে 'আলেকজান্দ্রিয়া' নামে তিনি একটি নূতন নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীনকালে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও বাণিজ্যের জন্য আলেকজান্দ্রিয়া ছিল জগতে বিখ্যাত। আজো এই শহরটি বর্তমান আছে এবং মিশরের একটি প্রধান নগর হিসাবে তা পরিচিত।

মিশর-জয়ের পর আলেকজান্দার তাঁর দিগ্বিজয়ী বাহিনী নিয়ে একের পর একটি রাজ্য জয় করতে থাকেন। এভাবে এক সুবিশাল

সাম্রাজ্য স্থাপনের পর ৩২৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে আলেকজান্দার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে কাবুলের পথে ভারতের সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ



করেন। ঐ সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলোর অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে আলেকজান্দার প্রায় বিনাযুদ্ধেই বহু রাজ্য জয় করে নেন। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করেন। যদিও একের পর একটি রাজ্য এভাবে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের কাছে আত্মসমর্পণ করে কিন্তু তাঁকে পুরুরাজ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়। ঝিলাম ও চিনাব নদীর মধ্যবর্তী রাজ্য ছিল পুরুরাজ্য। পুরুরাজ আলেকজান্দারের বশ্যতাস্বীকারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং যুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত আলেকজান্দারের বিপুল বাহিনীর কাছে পুরুরাজ পরাজিত হন। কিন্তু দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার পুরুরাজের বীরত্বে মুগ্ধ হন। বন্দী পুরুরাজকে তিনি সম্মান সহকারে মুক্তি দান করেন। বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে পুরুরাজের এই

আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ

বীরত্বের কাহিনী গ্রীক পণ্ডিতেরা খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে গেছেন।

আলেকজান্দারের ইচ্ছা ছিল আরো অগ্রসর হয়ে ঐ সময়ের ভারতের শক্তিশালী মগধরাজ্য জয় করা। কিন্তু গ্রীক বাহিনী তখন দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। বাধ্য হয়ে আলেকজান্দার দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভারতে অধিকৃত গ্রীক-রাজ্য শাসনের ভার তার সেনাপতি সেলিউকাসের উপর অর্পণ করে তিনি দেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন। দেশে ফেরার পথে ব্যাবিলন নগরে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে (৩২৩ খৃঃ পূঃ) আলেকজান্দারের মৃত্যু হয়।

আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু সেই প্রাচীন কালে তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ব্যবসা বাণিজ্যের আদান প্রদানের পথ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হয়। ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা। ঐ সময়ের গ্রীক পণ্ডিতদের রচনাবলী থেকে প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে, ভারতের ও অন্যান্য দেশের জীবন যাত্রা ও সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কাহিনীই জানা গেছে। শুধু দিগ্বিজয়ী বীর হিসাবেই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরাগী হিসাবে, বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং পরাজিতের প্রতি ভালো ব্যবহারের জন্য আলেকজান্দার সুপরিচিত। পরাজিত পারস্য-সম্রাট ডারউস-এর স্ত্রী ও কন্যার প্রতি তার সদয় ব্যবহার এবং পরাজিত বন্দী পুরু-রাজের প্রতি তাঁর সম্মানজনক ব্যবহার আলেকজান্দারের মহৎ গুণেরই পরিচয় বহন করছে।

আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়ের ফলাফল

আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে এবং গ্রীস দেশের ঐক্যও বিনষ্ট হয়। ১৪৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সমগ্র গ্রীস দেশই রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়

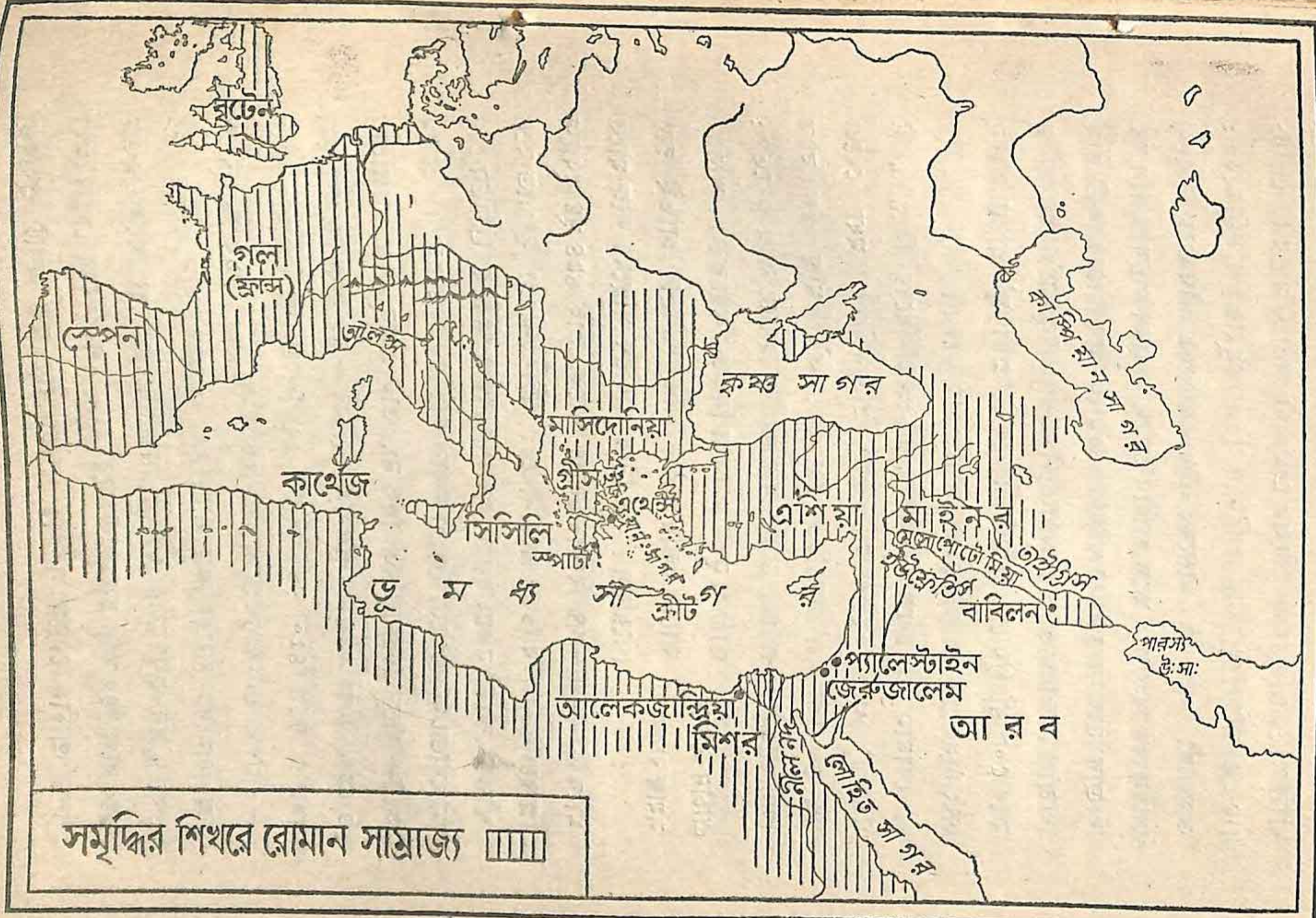
রোমান সাম্রাজ্য

ইতালীর রাজধানী রোম পৃথিবীর সব চেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ নগরীগুলোর অন্যতম। সুপ্রাচীন কালে রোমকে কেন্দ্র করে একটি উন্নত সভ্যতা ও বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। ইতালীর পশ্চিম উপকূলে তাইবার নদীর তীরে অবস্থিত রোম প্রথমে ছিল একটি নগণ্য কৃষক-পল্লী। কিভাবে রোম নগরীকে কেন্দ্র করে রোমান সভ্যতা ও সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তা খুবই চমকপ্রদ একটি কাহিনী।

পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায় ৭৫৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রাজা রোমুলাস-এর রাজত্বকালে (৭৫৩—৭১৬ খৃঃ পূঃ) রোম নগরী স্থাপিত হয়। রাজা রোমুলাস-এর নাম থেকেই রোম নগরীর নাম করা হয়। রোম নগরীর অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চার দিকেই তা ছিল নদী ও উচ্চ পাহাড় পর্বত দিয়ে ঘেরা। ফলে নগরীকে রক্ষা করা ছিল সহজ-সাধ্য। অন্যদিকে নদীপথে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে রোম ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে খুবই উপযোগী।

রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগেই গ্রীস দেশে একটি প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ভূমধ্য সাগরের তীরে তীরে যে গ্রীক উপনিবেশ সমূহ গড়ে উঠেছিল তার সংস্পর্শে এসে রোমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। রোম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের একটি মিলন-ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

খৃষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী ষষ্ঠ শতকে গ্রীসের মতোই রোমের জনগণ 'পাট্রিসিয়ান' ও 'প্লিবিয়ান' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। পাট্রিসিয়ান-গণ ছিলেন সমাজের ধনবান, অভিজাত এবং প্রধান


ব্রিটেন
গল (ফ্রান্স)
স্পেন
কার্থেজ
সিসিলি
মাসিদোনিয়া
গ্রীস
এথেন্স
স্পার্টা
ক্রীট
ভূমধ্য সাগর
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
এশিয়া মাইনর
মেসোপোটেমিয়া
ইউফ্রেটিস
টাইগ্রিস
বাবিলন
পারস্য উ: সা:
প্যালেস্টাইন
জেরুজালেম
আরব
আলেকজান্দ্রিয়া
মিশর
লোহিত সাগর
সমৃদ্ধির শিখরে রোমান সাম্রাজ্য

ব্যক্তিবর্গ ; প্লিবিয়ানগণ ছিলেন শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ। ভোট-দান ও রাজ্য শাসনের অধিকার ছিল শুধুমাত্র অভিজাতদের ; শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের এবং দাসদের দীর্ঘকাল কোনো অধিকারই ছিল না। ফলে প্রাচীন রোমে সাধারণ মানুষ ও দাসদের বিদ্রোহ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এভাবে একের পর একটি দাস বিদ্রোহে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অত্যাচারী রাজা তারকুইনকে অপসারিত করে ৫০৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রোমানগণ একটি 'প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেন এবং দাসগণকে কিছু কিছু অধিকার প্রদান করেন।

রোমান প্রজাতন্ত্রে অভিজাতগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'সিনেট' গঠিত হয়েছিল। এই প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে দুজনকে 'কনসাল' নির্বাচিত করা হত, এঁরা মাত্র এক বছর সেনাবাহিনীর প্রধান ও রোমের শাসক হিসাবে কাজ করতেন ; তারপর নূতন কনসাল নির্বাচন করা হত। শাসন-কার্যের ভার তাই অভিজাতগণের হাতেই রয়ে গিয়েছিল। এ নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মাঝে মাঝেই অভিজাতদের বিরোধ চলতে থাকে, তাই ৪৯৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দে প্লিবিয়ানদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 'ট্রিবিউন' বা মুখপাত্র বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ট্রিবিউন-দের নিষেধাজ্ঞা বা 'ভেটো' জারী করার অধিকার দেওয়া হয়। রোমে আইন-কানুনগুলো লিখিত ছিল না, তাই কোন্ কাজ বেআইনী হচ্ছে তা নিয়ে প্রায়ই সিনেটার ও ট্রিবিউন-দের মধ্যে বিরোধ দেখা দিত। তাই ৪৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ১২টি তাম্রপত্রে রোমের প্রধান প্রধান আইন-কানুনগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। ৪৪৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে প্লিবিয়ানদের আরো কিছু সামাজিক অধিকার মেনে নেওয়া হয় এবং দু'জন কনসালের একজন প্লিবিয়ানদের মধ্যে থেকে নেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়। এভাবে প্রায় দশ বছরের চেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রাচীন রোমে সরকার পরিচালনার জন্য একটি সুব্যবস্থা

প্রাচীন রোমের সমাজ ব্যবস্থা

গড়ে ওঠে। এক হিসাবে এটাকে বর্তমান আইন অনুযায়ী শাসন পরিচালনার প্রথম উদাহরণ বলা চলে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা রোমান সভ্যতার এক বিরাট দান।

কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ-কর্ম করতে খুবই সময় লাগত এবং যুদ্ধ বা বিপদের সময়ে এতে কাজ করা ছিল খুবই কঠিন। তাই একক নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়—এই সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে বলা হত 'ডিকটেটর'; প্রধানতঃ যুদ্ধ ও সংকটের সময়ে একচ্ছত্র প্রধান-নেতা বা ডিকটেটরকে নিয়োগ করা হত। রোমের প্রথম ডিকটেটর নির্বাচিত হন সিনসিনাটাস নামক একজন জ্ঞানী ও সৎ ব্যক্তি। তিনি কার্যতঃ ছিলেন সেনাপতি ও রাজার একটি মিলিত রূপ।

একটি সুসংগঠিত সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বলেই রোমানগণের পক্ষে কার্থেজ-এর মতো মহাপরাক্রমশালী রাজ্যের আক্রমণকে প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

রোম ও কার্থেজের বিরোধ এবং যুদ্ধ

ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে ছিল কার্থেজ নগরী। ইতালীতে যখন রোমের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সময়ে কার্থেজীয় বণিকেরা ইতালীর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সিসিলিতে নিজেদের অধিকার বিস্তার করে চলেছিল। কার্থেজ ছিল উত্তর আফ্রিকার একটি সমৃদ্ধ নগর রাষ্ট্র। উর্বর অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে খাদ্য-শস্যের দিক থেকে তা ছিল আত্মনির্ভর। বাণিজ্যের ব্যাপারে কার্থেজবাসীরা ছিলেন খুবই দক্ষ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল কার্থেজের সমৃদ্ধির প্রধান ভিত্তি। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম অঞ্চল, আফ্রিকা ও স্পেনের ফিনিসীয় উপনিবেশগুলো ছিল কার্থেজের অধীনে। ইতালীর নিকটবর্তী কোর্সিকা ও সার্দিনিয়া দ্বীপগুলো কার্থেজীয়রা দখল করে নেয়। এই শক্তিবৃদ্ধিতে রোমের সঙ্গে

কার্থেজের বিরোধ শুরু হয়। খৃঃ পূঃ ২৬৪ অব্দে কার্থেজ ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ পিউনিক যুদ্ধ নামে পরিচিত। রোমানরা কার্থেজের অধিবাসীদের বলত 'পিউন', তা থেকেই এই যুদ্ধকে বলা হয় পিউনিক যুদ্ধ। সব মিলিয়ে তিনটি যুদ্ধ চলে প্রায় ১১৯ বছর।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধে (খৃঃ পূঃ ২৬৪-২৪১) রোমান বাহিনী জয়লাভ করে। সন্ধির শর্ত অনুসারে সিসিলি ও সার্দিনিয়া রোমের অধিকারভুক্ত হয়। কার্থেজ দীর্ঘকাল ধরে বহু অর্থ-সম্পদ ক্ষতিপূরণ হিসাবে রোমকে দিতে অঙ্গীকার করে এবং রোম কার্থেজ থেকে প্রায় কুড়ি হাজার দাস সংগ্রহ করে। কিন্তু শুধু ঐ বৈষয়িক লাভ নয়, প্রথম পিউনিক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রোম একটি বিশাল নৌশক্তি গড়ে তুলতে শুরু করে এবং নৌযুদ্ধে রোমানরা সুদক্ষ হয়ে উঠেন। এই নৌশক্তির জোরেই রোম পরে ভূমধ্যসাগরে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেছিল।

তিনটি পিউনিক যুদ্ধ ও রোমের প্রাধান্য লাভ

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজীয় বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন বিখ্যাত বীর হানিবল। তাঁর সফল নেতৃত্বে কার্থেজের সৈন্যবাহিনী রোমকে পরাজয়ের মুখে নিয়ে যায়, কিন্তু কার্থেজীয় সরকার উপযুক্ত সাহায্য প্রেরণে ব্যর্থ হওয়ায় হানিবলকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। খৃঃ পূঃ ১৪৯ অব্দে রোম কার্থেজের বিরুদ্ধে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ শুরু করে; খৃঃ পূঃ ১৪৬ অব্দে কার্থেজ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং রোমের অধীনস্থ একটি প্রদেশে পরিণত হয়। কার্থেজের বিরুদ্ধে জয়লাভের ফলে ঐ সময়ে রোমের সর্বময় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।



হানিবল

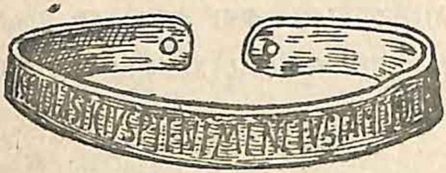
পিউনিক যুদ্ধে জয়লাভের পর রোমের সভ্যতা খুবই উন্নতি লাভ করে। সমগ্র রাজব্যাপী প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হয়। রোমের সঙ্গে সকল দেশের স্থলপথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সৈন্য চলাচলের জন্য এই রাস্তাগুলো ব্যবহৃত হত। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য রোমে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় এবং জল নিষ্কাশনের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়। বহু সুন্দর প্রাসাদ, মন্দির, স্নানাগার, আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র ইত্যাদি



রোমান থিয়েটার

ঐ সময়ে গড়ে তোলা হয়। অধিকৃত রাজ্যগুলো থেকে সংগ্রহ-করা কর দিয়ে রোমকে একটি শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করা হয়। কিন্তু রোমের এই সাফল্য ও সমৃদ্ধির যুগেও ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই ছিল। এ সবের ফলে যখন রোমের সমাজ-জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছে তখন এক নূতন বিপদ দেখা দিল। উত্তর দিক থেকে বর্বর জাতিগুলো রোমের ওপর আক্রমণ শুরু করল।

অন্যদিকে এই সময়ে রোমের দাসদের বিদ্রোহ রোমের অভিজাত শাসনের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে তুলল। রোমান ক্রীতদাসদের অবস্থা ছিল গ্রীক সমাজের ক্রীতদাসদের মতোই একেবারে অমানুষিক ও অবর্ণনীয়। পলাতক দাসদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হত। লোহা পুড়িয়ে দাসদের গায়ে দাগ-দেওয়া একটা সাধারণ নিয়ম ছিল।



ক্রীতদাসের গলাবন্ধ

দাসদের গলায় একটি 'গলাবন্ধ' বেঁধে রাখা হত। এই 'গলাবন্ধ' খুলে ফেললে দাসদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে পাহারা দেওয়া, শিকল পরিয়ে আটকে রাখা—এসব অত্যাচারের পথ গ্রহণ করেও বিদ্রোহী দাসদের ঠেকানো সম্ভব হয় নি।

এই দাস-বিদ্রোহগুলোর মধ্যে খৃঃ পূঃ ৮৩ অব্দে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাস-বিদ্রোহটি ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। স্পার্টাকাস

স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাসবিদ্রোহ

ছিলেন একজন দাস গ্লেডিয়েটর। রোমের অভিজাতেরা এই দাস গ্লেডিয়েটরদের বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশুর সঙ্গে কুস্তি লড়তে বাধ্য করতেন। এতে হয় দাসদের মরতে হত, না হয় পশুকে মরতে হত; আর অভিজাত দর্শকেরা তা দেখে উৎকট



গ্লেডিয়েটরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ

আনন্দ উপভোগ করতেন। যে সব সবল-দেহী দাসরা এই রকম

দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতেন তাঁদের বলা হত গ্লেডিয়েটর। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে প্রায় সত্তর জন গ্লেডিয়েটর প্রথমে বিদ্রোহ করে ভিসুভিয়াস পাহাড়ে চলে যান এবং অভিজাতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। রোমের সৈন্যদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে দাস-বাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত করা হয় এবং একটি বিরাট বিদ্রোহী দাস-বাহিনী গড়ে ওঠে। রোমের অভিজাতগণ অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু দাসদের নিজেদের মধ্যে একতার অভাবের ফলে দাস-বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং স্পার্টাকাস সহ বিদ্রোহীরা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন।



গ্লেডিয়েটর

একদিকে রোমের ভূস্বামী, বণিক ও অভিজাতদের মধ্যে দলাদলি এবং অন্যদিকে দাস-বিদ্রোহ ও সাধারণ রোমানদের মধ্যে অসন্তোষ যখন রোমকে দুর্বল করে তুলছে তখনই বর্বরদের আক্রমণ রোমকে পরাজয়ের মুখে এনে দাঁড় করাল। সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই দিগ্বিজয়ের পর দেশে ফিরে এসে সেনাপতি সীজার খৃঃ পূঃ ৪৯ অব্দে রোমের প্রধান নেতা ও কনসাল নির্বাচিত হন। এভাবে কার্যতঃ রোমে সীজারের একনায়কত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়।

জুলিয়াস সীজার

জুলিয়াস সীজার শুধু একজন বড় সেনাপতিই ছিলেন না, তিনি একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তারের এবং



জুলিয়াস সীজার

অধিকৃত দেশগুলোতে শান্তি স্থাপনের জন্য যাত্রা করেন। খৃঃ পূঃ ৫৫ অব্দে সীজার ইংলণ্ড জয় করেন। সীজারের জয়যাত্রা রোমের অন্য শাসকদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে এবং তাঁরা সীজারের ক্ষমতা

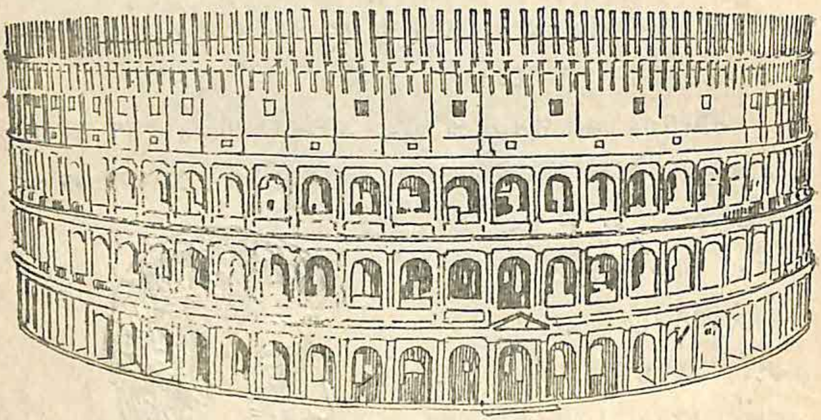
খর্ব করতে চেষ্টা করেন। সীজার সসৈন্যে রোমে ফিরে আসেন এবং খৃঃ পূঃ ৪৯ অব্দে রোমে সীজারের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। সীজারের প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি পম্পি মিশরে পালিয়ে গেছেন খবর পেয়ে সীজার মিশরে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং মিশরকে রোমের প্রভাবে নিয়ে আসেন। এই সময়ে সীজার অতি সহজে সিরিয়া ও এশিয়া-মাইনরের বিদ্রোহ দমন করেন এবং বিজয় গর্বে রোমে ফিরে আসেন। সীজার ঐ সময়ে (খৃঃ পূঃ ৪৫ অব্দে) রোমের প্রায় একচ্ছত্র শাসক হয়ে উঠেন।

সীজারের এই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে রোমের অভিজাতগণ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠেন এবং তাঁরা সীজারের বিরুদ্ধে এক গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হন। খৃঃ পূঃ ২২ অব্দের ১৫ই মার্চ সিনেট সভার অধিবেশনকালে হঠাৎ আক্রমণ করে চক্রান্তকারীরা সীজারকে হত্যা করেন। কিন্তু চক্রান্তকারীদের আশা পূর্ণ হয়নি। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে চক্রান্তকারীরা রোমানদের গণবিক্ষোভের সম্মুখীন হয় এবং পরাজিত হয়। জুলিয়াস সীজারের পোষ্যপুত্র অক্টোভিয়ান, তাঁর বন্ধু এনটোনিও এবং লেপিদাস—এই তিনজনকে নিয়ে রোমের একটি শাসকমণ্ডলী গঠিত হয়। অল্পকালের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্য অক্টোভিয়ান-এর একক শাসনাধীন হয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে রোমের সম্রাট হিসাবেই রাজকার্য চালনা করতে থাকেন। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে অক্টোভিয়ান 'অগাস্টাস' নাম ধারণ করে রোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র শাসক হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন। ৩১



অগাস্টাস

খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে প্রায় ৪৫ বছর অগাস্টাস বিশাল রোমান সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁর শাসনকালে রোম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটি নগরীতে পরিণত হয়। রোমে বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, মন্দির, প্রমোদ-উদ্যান, বিজয়-তোরণসমূহ, এবং বিখ্যাত ক্রীড়াক্ষেত্র কলোসিয়াম প্রভৃতি নির্মিত হয়। শুধু তাই নয়, এই সময়ে কাব্য,



রোমান কলোসিয়াম

সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে রোম প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করে। মহাকবি ভার্জিল এই সময়েই মহাকাব্য 'ঈনীড' রচনা করেন।

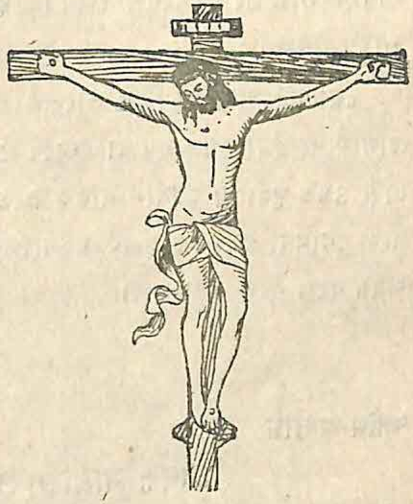
১৪ খৃষ্টাব্দে অগাস্টাস-এর মৃত্যু হয়। তাঁর শাসনকালে রোমের এমন শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল যে রোমানগণ অগাস্টাসকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করতেন এবং নানাস্থানে তাঁর নামে মন্দির নির্মাণ করা হয়।

যীশু খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম

অগাস্টাস সীজারের রাজত্ব কালে প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের বাসভূমি জুডিয়াতে যীশু খৃষ্টের জন্ম হয়। ঐ সময়ে প্যালেস্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই সময়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ ধর্মের মধ্যে শান্তি লাভের আশা

করতেন। দৈবশক্তিই মানুষকে রক্ষা করতে পারবে এই বিশ্বাস ঐ সময়ে খুবই প্রবল ছিল। খৃষ্ট নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করেন। খৃষ্টের মতামত জনসাধারণের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। খৃষ্টের বিরোধীরা এতে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে এবং খৃষ্ট নিজেকে 'রাজা' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চান বলে প্রচার চালাতে থাকে। এই অভিযোগে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে যীশু-খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যু-দণ্ড দেওয়া হয়।


ক্রুশ-বিদ্ধ যীশু

যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যগণ তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে থাকেন। তাঁরা খৃষ্টান অর্থাৎ খৃষ্টের অনুগামী বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। রোমানগণ খৃষ্টের অনুগামীদের নানাভাবে অত্যাচার করতে থাকে। রোমানদের ভয় ছিল খৃষ্টানগণ আসলে একটি পালটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। খৃষ্টের জন্মের পর প্রায় একশ বছর ধরে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের নির্মমভাবে হত্যা করা হত।

যীশুখৃষ্ট যে ধর্মমত প্রচার করেন তাতে ঈশ্বরের কাছে সকল মানুষই সমান—এটাই ছিল প্রধান কথা। এই ধর্মমত তাই খুব সহজেই নিপীড়িত ক্রীতদাস ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত জন-প্রিয় হয়ে ওঠে।

রোমানগণ খৃষ্টধর্মকে প্রথমে খুবই ভয়ের চক্ষে দেখতেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁরা এটা বুঝতে শুরু করলেন যে খৃষ্টধর্ম সাধারণ মানুষকে রাজা এবং ঈশ্বর উভয়ের আজ্ঞাধীন থাকার শিক্ষাই দান

করছে। তাই খৃষ্টধর্মকে অহেতুক ভয় করার কিছু নেই। খৃষ্টানদের বক্তব্য শোনা এবং তাকে বোঝার একটা সহনশীল মনোভাব ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

রোমান সম্রাট কনস্টেনস্টাইন ৩১৩ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্মকে রাষ্ট্র-ধর্ম রূপে স্বীকার করে নিলেন। খৃষ্টান যাজকেরাও সম্রাটকে খৃষ্টধর্মের প্রধান-ব্যক্তিরূপে মেনে নিলেন। খৃষ্টধর্ম এভাবে রোমের রাষ্ট্র-ধর্মে পরিণত হল।

রোমের সাম্রাজ্য কিন্তু তাতেও রক্ষা পেল না। উত্তর দিক থেকে জার্মান বাহিনীর ঘন ঘন আক্রমণে রোম নিতান্ত হীনবল হয়ে পড়ে এবং ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জার্মান নায়ক ওডোয়েকার নিজেকে রোমের রাজা বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনাকেই রোমের সাম্রাজ্যের পতনের সময় বলে মনে করা হয়।

অষ্টম অধ্যায়

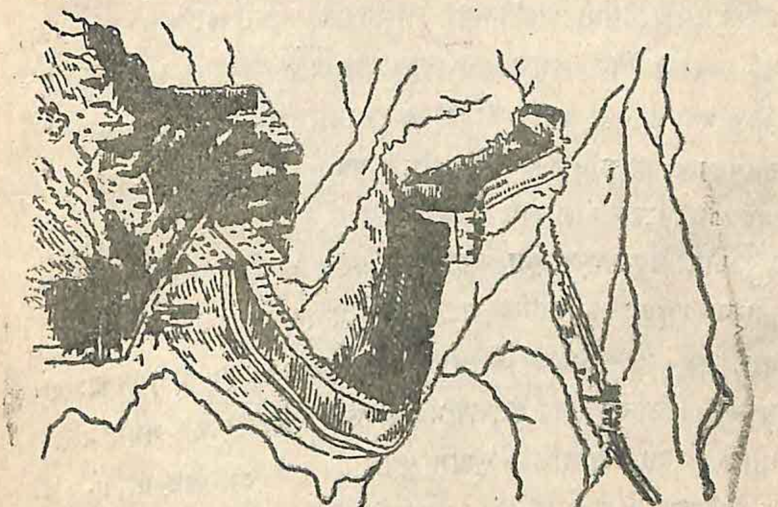
চীন ঃ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুগ

চীনের হোয়াং হো নদীর তীরে সুপ্রাচীন কালে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল; ঐ সময়ের নানা আবিষ্কারের ফলে একথা জানা গেছে। খৃষ্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগেই হোয়াং হো নদীর তীরে শক্তিশালী রাজ্যসমূহ গড়ে উঠেছিল। খৃষ্টের জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর আগেই চীনে বিখ্যাত শেঙ্ বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আবিষ্কৃত তথ্য থেকে ঐ সময়ে ব্রোঞ্জ, সোনা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার যে শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। রাজাদের বহু কবর এবং রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন তথ্য ও লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, হোয়াং হো নদীর অববাহিকায় দাস-সমাজভিত্তিক বিরাট বিরাট রাজ-সমূহ বর্তমান ছিল। খৃষ্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে

চীনে অবশেষে সাতটি বড় বড় রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যে আধিপত্য নিয়ে সব সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেকার এই বিরোধের সুযোগ নিয়ে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে চিন বংশের প্রতিষ্ঠাতা চিন শি হুয়াং তি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং খৃঃ পূঃ ২২১ অব্দে চীনে তিনি ঐক্য-বদ্ধ একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন। তিনি সুসজ্জিত একটি বিশাল ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং সমগ্র রাজ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে শাসন করার ব্যবস্থা করেছিলেন। সাত লক্ষ দাস-শ্রমিক নিযুক্ত করে সম্রাট চিন তাঁর সমৃদ্ধ রাজধানী গড়ে তুলেছিলেন বলে জানা গেছে।

এর আগেকার বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে হানাহানি, বন্যা ও খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগই চীনের একমাত্র বিপদ ছিল না। চীনের



চীনের প্রাচীর

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাসকারী বহু সংখ্যক শক্তিশালী যাযাবর ও অন্যান্য দস্যুবাহিনী বারে বারে চীন দেশকে লুণ্ঠন করত। এইসব লুণ্ঠনকারীদের আক্রমণের হাত থেকে চীন দেশকে রক্ষা

করার জন্য সম্রাট চিন-এর রাজত্বকালে সমুদ্র তীর থেকে উত্তরের উচ্চ পর্বত পর্যন্ত প্রায় ১৪০০ মাইল দীর্ঘ এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এই প্রাচীর ২০ থেকে ৩০ ফুট উঁচু এবং ২৫ ফুট প্রশস্ত ; ছয়জন অশ্বারোহী সৈনিক তা দিয়ে পাশাপাশি দৌড়াতে পারেন। কিছু দূরে দূরে দুর্গ ও পাহারা দেওয়ার জন্য উঁচু মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। প্রায় বিশ লক্ষ দাস-শ্রমিক ও কৃষক বহু বছরের কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়কর এই প্রাচীরটি নির্মাণ করেন।

এই প্রাচীর নির্মাণের ফলে চীনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের বিপদ হ্রাস পায়। এই প্রাচীরের দক্ষিণপ্রান্ত দিয়ে পশ্চিম দিকে একটি দীর্ঘ ও নিরাপদ বাণিজ্যপথ গড়ে ওঠে। এই পথে পশমের ব্যবসায়ীরা নিরাপদে যাতায়াত করতেন বলে এই বাণিজ্যপথটি ইতিহাসে 'রেশমী পথ' নামে পরিচিত। পণ্যবাহী পশুদল নিয়ে বণিকেরা প্রাচীন কালে এই পথে যাতায়াত করতেন। এই পথ দিয়ে মধ্য-এশিয়া হয়ে ভারত ও মেসোপোটেমিয়ার সঙ্গে চীনের বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিখ্যাত বহু ভ্রমণকারী এই পথ দিয়েই যাতায়াত করেছেন।

চীন যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল সেই সময়ে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ও হানাহানির যুগে কনফুসিয়াস নামে একজন জ্ঞানী, দার্শনিক ও প্রচারক ঐ দেশে (৫৫১—৪৭৯ খ্ঃ পূঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ব্যক্তি। সমাজে সুনীতি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য তিনি বহু নীতি-কথা ও উপদেশ দিয়ে গেছেন। কোনো নির্দিষ্ট ধর্মমতের তিনি প্রবর্তন করেননি ; তিনি গৌতম বুদ্ধের মতো একটি নীতি-ধর্মের কথাই বলে গেছেন। পরবর্তী কালে সারা চীন দেশে কনফুসিয়াসের উপদেশ বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং তা চীনের প্রধান আচরণীয় নীতি-ধর্মে পরিণত হয়।

নিজের জীবিতকালে কনফুসিয়াসের মতামত বিশেষ সমাদর করেনি। কিন্তু কালক্রমে চীনের বিভিন্ন সম্রাট কনফুসিয়াসের মত রাজধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেন এবং এভাবে তা চীনে তা স্থাপনের অন্যতম একটি ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। চিন বংশের রাজত্বকালে চীনের বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটে। হূন-আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য চিন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চিন চীনের বিখ্যাত প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শী হোয়াং তি পিতার পথ অনুসরণ করে চীনদেশে একটি প্রবল শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। ভারতে সম্রাট অশোকের রাজত্বের সমসাময়িক এই চিন বংশের শাসন কালেই চীনে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজশক্তি গড়ে ওঠে।

খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্বেই চীনদেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি লাভ করেছিল। ঐ সময়ে চীনের লিখিত ভাষার প্রচুর উন্নতি হয়। কাঠে ও পাথরে খোদাই করে এবং বাঁশ থেকে নির্মিত এক ধরনের কাগজে ছাপার ব্যবস্থা চীনেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল। লোহার ব্যবহার চীনে খৃষ্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল। জ্বালানি হিসাবে কয়লার ব্যবহার চীনেই প্রথম শুরু হয়। নক্ষত্রবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে চীনে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ঋতু-পরিবর্তন, বছর ও মাসের হিসাব ইত্যাদি অত্যন্ত নির্ভুলভাবেই ঐ সময়ে রাখা হত। গণিতবিদ্যা এবং চিকিৎসা-বিদ্যার ক্ষেত্রে চীনে প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছিল ; প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তার বহু প্রমাণও পাওয়া গেছে। প্রাচীন চীনেই সর্বপ্রথম দিক-নির্ণয় করার যন্ত্র কম্পাস আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং অতি প্রাচীন কালেই চীনে ভূমিকম্প নিরূপণের ব্যবস্থা জানা ছিল। পানীয় হিসাবে চায়ের ব্যাপক ব্যবহার চীনেই প্রথম শুরু হয়েছিল। রেশমী বস্ত্র নির্মাণে চীনের হস্ত-শিল্পীদের খ্যাতি অত্যন্ত সুপ্রাচীন। চিত্রকলা, হস্ত-শিল্প ও মূর্তি-নির্মাণে চীনের সভ্যতার প্রচুর অবদান রয়েছে।

নবম অধ্যায়

ভারতের ইতিহাস

ভারতে আর্যদের আগমন

আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় তা নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। তবে আর্যরা বাইরের কোনো দেশ থেকে ভারতে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন,এ বিষয়ে সাধারণভাবে পণ্ডিতেরা একমত। মধ্য এশিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল আর্যদের আদি বাসভূমি বলে উল্লিখিত হয়েছে। ভারতে এই আর্যরা যে সভ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন তা 'আর্য সভ্যতা' নামে পরিচিত এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'-এর নাম অনুসারে এই সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা হিসাবেও পরিচিত।

'আর্য' কথাটির অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বংশজাত ও সুসভ্য। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাসকারী আর্যরা ভারতের আদিম অধিবাসীদের অনার্য, দাস, দস্যু, দৈত্য ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক নামে অভিহিত করতেন। আর্যরা যে ভারতে বহিরাগত এ থেকে তার একটা অনুমান করা যায়। আর্যরা ঠিক কখন ভারতে এসেছিলেন তা বলা কঠিন। আর্যরা প্রথমে সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলেই বসবাস করতে শুরু করেন। এই অঞ্চলকে আর্যরা **সপ্তসিন্ধু** বলে অভিহিত করেন। ক্রমে ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারতে আর্যদের বসতি স্থাপিত হয় এবং উত্তর ভারত প্রাচীন কাল থেকেই 'আর্যাবর্ত' নামে পরিচিত হয়। পরে দক্ষিণ ভারতেও আর্যদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। বৈদিক ঋষি অগস্ত্যের বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্য গমনের পৌরাণিক কাহিনী থেকে তা বোঝা যায়।

আর্য সভ্যতা সম্পর্কে আমরা বেদ ও বৈদিক সাহিত্য থেকে

জানতে পারি। আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে 'বেদ'। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন বেদ কোনো মানুষের রচনা নয়— তা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া। আর্যরা মনে করেন বেদ অভ্রান্ত। বেদ বলে কোনো লিখিত গ্রন্থ ছিল না। ঋষিগণ মুখে মুখে বেদ আবৃত্তি করতেন। গুরুর কাছে অধ্যয়ন করে শিষ্যরা বেদ মুখস্থ করে নিতেন। তাই বেদের অপর নাম হচ্ছে **শ্রুতি**। বেদ পাঠে ভুল হলে বিপদ ও অমঙ্গল হবে বলে মনে করা হত, তাই শ্রুতি-নির্ভর হলেও বৈদিক মন্ত্রের কোনো বিকৃতি ঘটেনি।

বেদ চার ভাগে বিভক্ত—**ঋক, যজু, সাম** এবং **অথর্ব**। প্রতিটি বেদের আবার দু'টি ভাগ রয়েছে। পদ্যে রচিত অংশকে **সংহিতা** এবং গদ্যে রচিত অংশকে **ব্রাহ্মণ** বলা হয়। পরবর্তী কালে **আরণ্যক** ও **উপনিষদ** নামে বেদের আরো দু'টি ভাগের সৃষ্টি হয়। উপনিষদ বেদের অন্ত বা শেষ অংশ তাই উপনিষদ বেদান্ত নামেও পরিচিত।

আর্য ঋষিগণ কালক্রমে আয়ুর্বেদ (চিকিৎসা শাস্ত্র), ধনুর্বেদ (যুদ্ধবিদ্যা), সঙ্গীত ও শিল্পশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বেদ, বৈদিক-সাহিত্য ও বিভিন্ন শাস্ত্রাদি নিয়ে আর্যদের একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য-ভাণ্ডার গড়ে ওঠে।

বর্ণভেদ ও চতুরাশ্রম

প্রাচীন আর্য সভ্যতার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল **বর্ণভেদ প্রথা** ও **চতুরাশ্রম**। আর্যদের মধ্যে প্রথমযুগে বর্ণভেদ ছিল প্রধানতঃ বিজয়ী গৌরবর্ণ আর্যজাতি ও বিজিত অনার্য জাতিগুলোর মধ্যে কালক্রমে আর্যদের মধ্যে গুণ ও কর্ম বিভাগ অনুসারে **ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য** ও **শূদ্র** এই চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞ করতেন ও শাস্ত্র আলোচনায় নিযুক্ত থাকতেন। ক্ষত্রিয়দের কাজ ছিল রাজ্য শাসন ও যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করা। কৃষিকার্য, শিল্প ও বাণিজ্য করতেন বৈশ্যগণ এবং যাঁরা ভৃত্য ও দাস হিসাবে কাজ করতেন তাঁরা হলেন

শূদ্র। প্রথমে পেশা ও বৃত্তি-নির্ভর হলেও এই বর্ণভেদ ক্রমে কঠোর হয়ে ওঠে এবং জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হয়। আর্যগণ মানুষের জীবনকে চারটি 'আশ্রম' বা ভাগে বিভক্ত করতেন। এই চারটি আশ্রম হল **ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ** এবং **সন্ন্যাস**। সকলের পক্ষে চতুরাশ্রম পালন সম্ভব না হলেও ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য ছিল সকলের পক্ষেই অবশ্য-পালনীয়। এই সব প্রথার মধ্য দিয়ে আর্যরা সমাজে একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন।

আর্যদের ধর্মীয় জীবন

আর্যরা বহু দেব দেবীর পূজা অর্চনা করতেন। তাঁরা প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে দেব-দেবী জ্ঞানে বন্দনা করতেন। দেবতাদের তুষ্টির জন্য আর্যরা নানা যাগযজ্ঞ করতেন এবং যজ্ঞাদিতে দুধ, ঘি, যব ইত্যাদি অহুতি দেওয়া হত। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও পূজা-অর্চনা করতেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা। যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান যাতে ব্রাহ্মণেরা নির্বিঘ্নে করতে পারেন তা দেখার ভার ছিল ক্ষত্রিয় রাজা ও বীর পুরুষদের ধর্মীয় কর্তব্য।

আর্যদের সমাজ-জীবন

আর্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। পরিবারের প্রধানকে গৃহস্বামী বলা হত। কয়েকটি পরিবারকে নিয়ে একটি গ্রাম এবং অনেকগুলো গ্রাম নিয়ে একটি 'জন' গঠিত হত। গ্রামের প্রধানকে বলা হত 'গ্রামণী' বা 'গ্রাম-প্রধান'। 'জন'-এর প্রধান রাজা বলে পরিচিত ছিলেন এবং তার শাসিত অঞ্চলের তিনি সর্বময়-কর্তা বলে গণ্য হতেন। বৈদিক যুগে সাধারণভাবে রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও তা ছিল এক ধরনের গোষ্ঠী-তান্ত্রিক গণশাসন। গ্রাম-প্রধান, সেনাপতি, মন্ত্রণাদাতা ও পুরোহিতের পরামর্শ অনুসারে রাজারা রাজ্য শাসন করতেন। রাজারা সর্বশক্তিমান হলেও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে প্রাধান্য নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ হত। প্রভাবশালী

রাজারা 'রাজসূয়' ও 'অশ্বমেধ' প্রভৃতি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে নিজেদের সম্রাট বা রাজচক্রবর্তী বলে ঘোষণা করতেন।

বৈদিক সমাজে নারীদের উচ্চ আসন ও মর্যাদা ছিল। পিতার কাছে মেয়েরা সুশিক্ষার সুযোগ পেতেন। শাস্ত্র চর্চায় বৈদিক যুগে নারীদের দান কম নয়; ঘোষা, অপালা, লোপামুদ্রা প্রমুখ নারীরা বিভিন্ন মন্ত্র রচনা করে গেছেন। গার্গী ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বেদজ্ঞা নারীর নাম সুপরিচিত। কিন্তু সমাজে পুরুষেরই প্রাধান্য ছিল। আর্যদের মধ্যে বহু-বিবাহের প্রচলন হয় এবং তার ফলে নারীদের অধিকার অনেক খানি খর্ব হয়।

বৈদিক যুগে টাকা-কড়ির প্রচলন ছিল না— বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। গরুর সংখ্যা দিয়ে দ্রব্যমূল্য স্থির হত। আর্যরা কৃষিকার্য ও পশুপালনে খুবই দক্ষ ছিলেন। নানা হস্ত-শিল্প ও বিভিন্ন অলঙ্কার ইত্যাদি ব্যবহার্য দ্রব্যাদি নির্মাণে তারা উন্নত-স্তরে পৌঁছেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমুদ্র যাত্রার ইঙ্গিত জল-দেবতা বরুণের স্তুতির মধ্যে দেখা যায়।

বৈদিক যুগের প্রসারের মধ্য দিয়ে আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটে। ক্রমে বর্ণ-ভেদের উদারতা লুপ্ত হয় এবং সমাজে জাতিভেদ দেখা দেয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৈশ্য ও শূদ্রদের সামাজিক মর্যাদার হানি ঘটে। জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার প্রচলিত হয় ও মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়। নিছক গ্রামীণ সভ্যতার পাশাপাশি জনবহুল ও সমৃদ্ধ নগর-জীবন গড়ে ওঠে।

আর্যদের সমাজ জীবনের এই পরিবর্তনের ধারা 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' নামক দু'খানি প্রাচীন মহাকাব্যের মধ্যে জীবন্ত হয়ে রয়েছে। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' শুধু দু'খানি মহাকাব্য নয়; তার মধ্যে প্রাচীন ভারতের সমাজের সকল স্তরের মানুষের জীবন-ধারা, রীতিনীতি এবং ন্যায়-অন্যায়বোধ অজস্র অমৃতময় কাহিনীর

মধ্যদিয়ে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। এই দুখানি মহাকাব্য কোনো ইতিহাস-গ্রন্থ নয়। কিন্তু মহাকবিদের রচনার মধ্য দিয়ে ঐ যুগের সমাজ-চিত্রই তাতে ফুটে উঠেছে এবং ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল গতিধারাটি তা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রামায়ণে রামচন্দ্রের জীবনকথা এবং মহাভারতে পাণ্ডব ও কৌরবদের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শুধু যুদ্ধ-কাহিনী নয়; আর্য ভারতের জীবন ও সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবিই 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' এই দুই মহাকাব্যে অঙ্কিত রয়েছে। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনকে এই দু'খানি মহাকাব্য প্রভাবিত এবং মানুষের নৈতিক জীবনকে নির্ধারিত করে এসেছে।

রামায়ণ ও মহাভারতে প্রাচীন ভারতের সমাজ-চিত্র

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

বৈদিক যুগের শেষ ভাগে আর্যদের ধর্মীয় ও সমাজজীবনে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শাস্ত্র আলোচনা, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠান একান্ত আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে পড়ে। বেদ, ব্রাহ্মণ ও রাজাদের অন্ধভাবে মেনে চলার জন্য ব্রাহ্মণেরা জোর করতে লাগলেন। সমাজে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ নানা রকম বিক্ষোভের সৃষ্টি করল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে অজস্র পশুবলি দেওয়া হত। এই হিংস্রতা অনেকেই পছন্দ করত না। ক্রমে ক্রমে এই ধরনের নানা বিক্ষোভ একটি বিরাট ধর্ম-আন্দোলনের আকার ধারণ করে। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও আড়ম্বরপূর্ণ আচার অনুষ্ঠানের প্রতিবাদেই ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ঘটে।

খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে জৈনধর্ম-প্রবর্তক মহাবীর বৈশালীর এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীর বর্ধমানকে জৈন ধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়। প্রকৃত পক্ষে মহাবীরকে জৈনদের চব্বিশজন ধর্ম প্রচারকের সর্বশেষ ব্যক্তি

বলে … রা হয়। জৈনরা মহাবীরকে সর্বশেষ 'তীর্থঙ্কর' বা ধর্ম-প্রবর্তক … নে করেন। মহাবীর জৈনধর্মকে পূর্ণরূপ দিয়েছিলেন বলেই মনে করা হয়। জৈন কথাটি এসেছে 'জিন' এই শব্দ থেকে। 'জিন' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়-জয়ী'; অর্থাৎ তপস্যার পর মহাবীর ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন বলে তাঁকে 'জিন' বলা হত এবং তাই তাঁর শিষ্যদের জৈন বলা হত।

মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর ছিলেন **পরেশনাথ**। এরা দুজনেই হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা সরল কিছু সুনীতিকে ধর্ম-পালনের প্রধান নিয়ম হিসাবে প্রচার করেন। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য (চুরি না-করা) এবং অ-প্রতিগ্রহ (কোনো দান গ্রহণ না-করা)-কে চারটি সদাচার হিসাবে হাজির করেন। পরেশনাথের এই চারটি সদাচারের সঙ্গে মহাবীর ব্রহ্মচর্যকে যুক্ত করেন। এই পাঁচটি নীতিকে মহাবীরের প্রচারিত পঞ্চ-মহাব্রত বলা হয়। জৈনরা কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন।



মহাবীর

অত্যন্ত সহজ সরল নীতি-ধর্মের অনুসরণের মধ্য দিয়ে জৈনরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিবাদে নিজেদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মৌর্যযুগের প্রথম দিকে জৈনধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা গেছে।

গৌতমবুদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তিনি ছিলেন জৈনধর্ম-প্রবর্তক মহাবীরের প্রায় সমসাময়িক। হিমালয়ের পাদদেশের তরাই অঞ্চলের শাক্য নামক ক্ষত্রিয় বংশের রাজা শুদ্ধোদন-এর পুত্র গৌতম কপিলাবস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁর মা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। গৌতমের অন্য নাম ছিল সিদ্ধার্থ। রাজার পুত্র হয়েও সিদ্ধার্থ ছিলেন অত্যন্ত ভাবুক-প্রকৃতির। আনন্দ ও ঐশ্বর্য তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে নি। পিতা তার পুত্রকে সংসারে আগ্রহী করার জন্য ষোল বছর বয়সেই যশোধরা বা গোপা নাম্নী এক রূপবতী কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দেন। কিন্তু মানুষের জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও মৃত্যু সিদ্ধার্থকে বিচলিত করতে থাকে। এমন সময় তাঁর রাহুল নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। সংসারে জড়িয়ে পড়বেন না স্থির করে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেন।



বুদ্ধদেব

কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি গয়ার নিকটে বর্তমান বুদ্ধগয়ায় একটি বটবৃক্ষের তলে বোধি বা সত্যজ্ঞান লাভ করেন এবং 'বুদ্ধ' নামে পরিচিত হন। তাঁর প্রচারিত ধর্মই বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত। বুদ্ধদেব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম-প্রচারকদের অন্যতম হিসাবে আজো বিশ্বের নানা দেশে পূজিত হন। জীবনের প্রায় ৪৫ বছর তিনি উত্তর-ভারতের সর্বত্র ধর্মপ্রচার করেন এবং তাঁর জীবিত কালেই তাঁর ধর্মমত ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। আশি বছর বয়সে কুশীনগরে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন।

মানুষের এই দুঃখের কারণ নির্ণয় এবং তাকে দূর করার পথ সম্পর্কে বুদ্ধ সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের নিজেদের ভাষায় সরলভাবে বুঝিয়ে উপদেশ দিতেন। একদিকে ভোগবিলাস এবং অন্যদিকে শরীরকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া এই দুই চরম মতের মধ্যবর্তী একটি পথের কথাই তিনি অনুসরণ করতে বলতেন। তাই বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মপথ 'মধ্যপন্থা' বলে পরিচিত। সৎজীবন যাপনের জন্য তিনি আটটি সরল নীতির কথা বলতেন। এই আটটি নীতি অনুসরণ করলে মানুষ মুক্তি অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করবে বলে তিনি প্রচার করেন। সৎ কর্ম, সৎ আচার, সত্য ভাষণ, অহিংসা প্রভৃতি হচ্ছে তাঁর প্রচারিত প্রধান নির্দেশ। প্রাণীহত্যা না করা, চুরি না করা, বিলাস, ধনলিপ্সা ও যাগযজ্ঞে পশু বলিদান করা থেকে বিরত থাকাই ছিল তাঁর প্রধান উপদেশ। তাঁর দেহত্যাগের পর বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মমতগুলো 'ত্রিপিটক' নামে পরিচিত তিনটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বুদ্ধদেবের প্রচারিত এই সরল নীতি-ধর্মগুলো অল্প কালের মধ্যেই সমাজের সাধারণ এবং অবহেলিত মানুষের মধ্যে বিরাট জনপ্রিয়তা লাভ করে। ক্রমে রাজা ও ধনী ব্যক্তিরাও তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করতে থাকেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ সুসংগঠিত বৌদ্ধ-বিহার ও সঙ্ঘ গড়ে তুলেন। ক্রমে বৌদ্ধধর্মের বিপুল বিস্তার ঘটে। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর বৌদ্ধ ভিক্ষু ও প্রচারকগণ তাঁর ধর্মমতকে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকেন। মহারাজ অশোক ও কণিষ্ক প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটগণের সহায়তা লাভ করে বৌদ্ধধর্ম ভারতে ও ভারতের বাইরে, বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায়, বিরাট বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে ভারতের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

ভারতের সাম্রাজ্য সমূহ

মৌর্যসাম্রাজ্য

আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের সময় মগধে নন্দরাজবংশ রাজত্ব করছিলেন। নন্দরাজারা বিশাল ও শক্তিশালী একটি রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু নন্দরাজাদের বিরুদ্ধে রাজ্যে নানা রকম অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক বাহিনীর সহায়তা নিয়ে নন্দবংশের ধ্বংস-সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। আলেকজান্দার চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করতে রাজী হন নাই কারণ আলেকজান্দারের সৈন্যরা দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। আলেকজান্দারের ভারত-ত্যাগের কিছুকালের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশকে ধ্বংস করে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

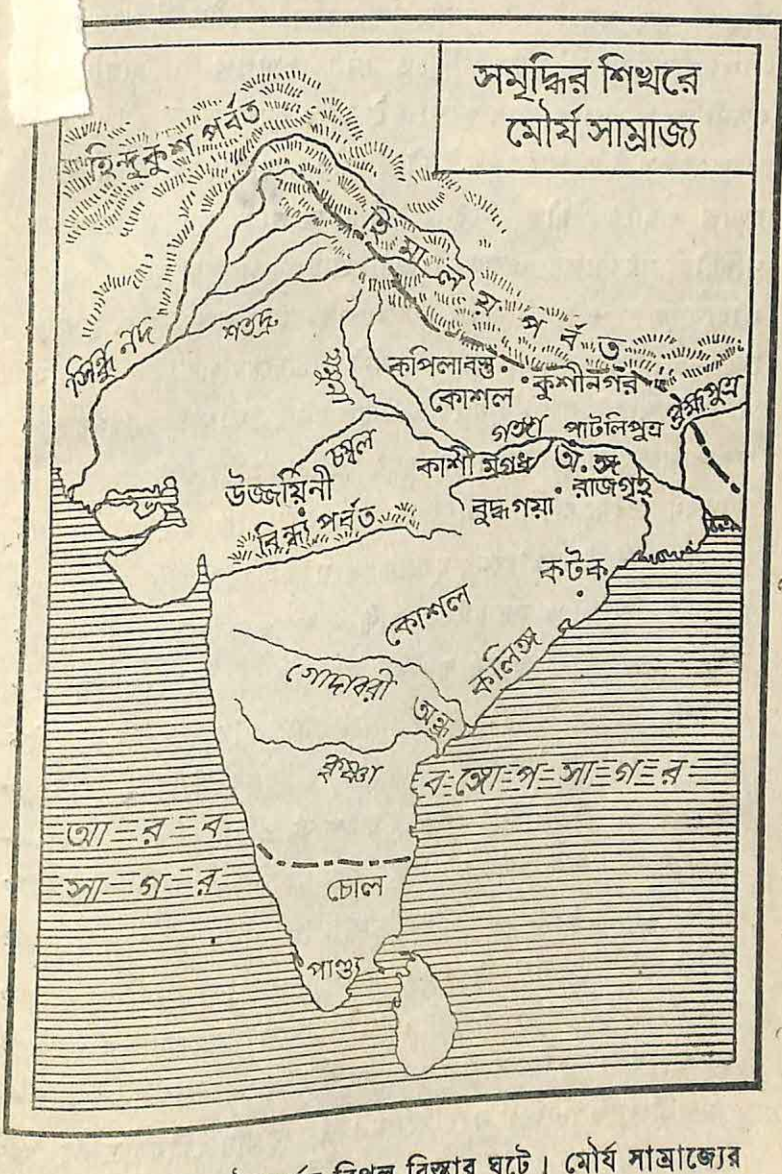
নন্দ-বংশকে ধ্বংস করা ও মৌর্যসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঐ যুগের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায়। মগধের সিংহাসনে আরোহণের পর চন্দ্রগুপ্ত ভারত থেকে বৈদেশিক গ্রীকবাহিনীকে বিতাড়িত করেন। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে তিনি সিন্ধুতীরবর্তী গ্রীক শাসকদের বিতাড়িত করেন এবং গ্রীক সেনাপতি সেলিউকাসকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বেলুচিস্থানকে তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন। সেলিউকাস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে বাধ্য হন। এভাবে সুদূর কান্দাহার থেকে সমগ্র উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চন্দ্রগুপ্তের বিশাল একটি সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। দীর্ঘকাল এই সাম্রাজ্যকে সুশৃঙ্খল ভাবে শাসন করার পর আনুমানিক ৩০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়।

মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, বিম্বিসার ও অশোক

চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার (বা বিম্বিসার) মৌর্য

বিম্বিসার হর্যঙ্ক বংশীয় রাজা। তিনি খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মগধে রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র [illegible] অজাতশত্রু।

রাজ্যের আয়তন আরও বৃদ্ধি করেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম করেছিলেন। সম্রাট বিম্বিসার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং



এই সময়ে ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিপুল বিস্তার ঘটে। মৌর্য সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিস্তার ও সমৃদ্ধি ঘটে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। সম্রাট

অশোক কলিঙ্গরাজ্য (বর্তমান উড়িষ্যা) জয় করেন। কিন্তু কথিত আছে, এই যুদ্ধে যে রক্তপাত হয় তাতে অশোক অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধের পথ পরিত্যাগ করেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে অশোক 'ধর্মাশোক' নামে পরিচিত হন। চন্দ্রগুপ্ত ও বিম্বিসারের যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করে অশোক মৈত্রী ও ধর্ম-বিজয়ের নীতি গ্রহণ করেন। সম্রাট অশোকের এই নীতি মৌর্য সাম্রাজ্যকে তার গৌরবের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করে। সম্রাট অশোক শুধু ভারতের নয় পৃথিবীর সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ-সম্রাট বলে গন্য হন। প্রথম জীবনে হিংসা ও অত্যাচারের জন্য অশোক 'চণ্ডাশোক' নামে কুখ্যাত ছিলেন। কিন্তু কলিঙ্গ যুদ্ধের পর ধর্মনীতি গ্রহণের পর তিনি 'রাজর্ষি' ও 'ধর্মাশোক' ইত্যাদি নামে পরিচিত হন। তার উদার ধর্মমত ও সুশাসনের ফলে মৌর্যসাম্রাজ্য খুবই প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রীর নীতি প্রচার করাই তাঁর জীবনের মূলব্রত হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ভগবান বুদ্ধের অহিংসা ও সদাচারের বাণী পাথর ও স্তম্ভের গায়ে খোদাই করে রাজ্যের নানা স্থানে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে সিংহল, পশ্চিম-এশিয়া, মিশর এমন কি গ্রীসদেশে পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। এর ফলে ভারতের বাইরের বহু দেশের সঙ্গে মৌর্য-সাম্রাজ্যের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের ভিতরে ও বাইরে বহু সৎ কাজের জন্য মহারাজ অশোক 'প্রিয়দর্শী' নামে পরিচিত হন। অশোকের শিলালিপি ভারত-ইতিহাসের একটি বিশেষ উপাদান বলে গণ্য হয়। অশোক শুধু শিলালিপি এবং স্তম্ভ স্থাপন করেই ক্ষান্ত হন নি; তিনি নিজে রাজ্যের মধ্যে এই ধর্ম-প্রচার অভিযানে বাহির হন এবং এই কাজের জন্য বিশেষ রাজ-কর্মচারীদেরও নিয়োগ করেছিলেন। এক কথায় মৌর্যসাম্রাজ্য এই সময়ে তার গৌরবের শিখরে পৌছে।

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যসাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর

বংশধরদের মধ্যে তেমন উপযুক্ত কোনো শাসক ছিলেন না এবং এই দুর্বল শাসকদের পক্ষে বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-পশ্চিম ভারতে শক ও কুষাণদের আক্রমণ শুরু হয়। অন্যদিকে রাজ্যের দক্ষিণে সাতবাহন বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সারা দেশে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

গুপ্তসাম্রাজ্য

দেশকে এই বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম্রাটগণ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্তবংশের সম্রাটগণ মগধে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত এই পাঁচজন বিখ্যাত গুপ্ত সম্রাট প্রায় দেড়শত বছর ধরে একটি সুশাসিত বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন আরোহণ করেন। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন একজন দিগ্বিজয়ী বীর। তিনি নানা সদগুণে ভূষিত ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তকে গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে গণ্য করা হয়। তাঁর সভাকবি হরিষেণ রচিত বিবরণ থেকে সমুদ্রগুপ্তের সম্রাজ্যবিস্তার ও বিবিধ গুণপনা সম্পর্কে জানা গেছে। ঐ সময়ের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ঐ সময়ের একজন চীনদেশীয় লেখকের বিবরণ থেকেও সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে।

সমগ্র উত্তর-ভারত জয়ের পর সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের বিরাট অঞ্চলে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। বিভিন্ন রাজ্য জয়ের পর সমুদ্রগুপ্ত বিজিত রাজ্যগুলো ঐসব রাজাদের ফিরিয়ে দেন এবং তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। সমুদ্রগুপ্ত বিশাল সাম্রাজ্য নিজের শাসনাধীনে রাখেন নি, তবে তিনি ভারতের এক বিশাল অঞ্চলের

উপর নিজের প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। এরফলে গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। সমুদ্রগুপ্ত 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' অনুষ্ঠান করেছিলেন, এ থেকে তার বিরাট প্রভাবেরই প্রমাণ মিলে। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত একজন সুশাসক, সঙ্গীতরসিক এবং সুকবি ছিলেন বলে তাঁর সভাকবি হরিষেণ লিখে গেছেন। সমুদ্র-গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৩ খৃঃ) রাজত্ব করেন। তিনি শকদের আক্রমণ দমন করে 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন এবং 'বিক্রমাদিত্য' নামে পরিচিত হন। তাই অনেকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে ভারতের কিংবদন্তীর উজ্জয়িনীর সম্রাট বিক্রমাদিত্য বলে মনে করেন। মালব জয়ের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উজ্জয়িনীতে গুপ্তসাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজ-ধানী স্থাপন করেছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নয়জন পণ্ডিত 'নবরত্ন' নামে পরিচিত তাঁদের অন্যতম মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালের লোক বলে অনুমান করা হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালের বিস্তারিত বিবরণ ফা হিয়েন নামক একজন চীনদেশের পর্যটকের রচনা থেকে জানা গেছে। তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও শাসন- পদ্ধতির বিশেষ প্রশংসা করে গেছেন।



বীণাবাদন-রত সমুদ্রগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত নামে দুজন প্রসিদ্ধ রাজা গুপ্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর হূণদের আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকাল ভারত-ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' বলে বর্ণিত হয়েছে। গুপ্ত সম্রাটদের সুশাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার, শিল্পকলা ও সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে সহনশীলতার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনকালে ভারতের ইতিহাসে এক সমৃদ্ধ যুগের সৃষ্টি হয়। 'অজন্তার' বিখ্যাত

ভারতের 'স্বর্ণযুগ'

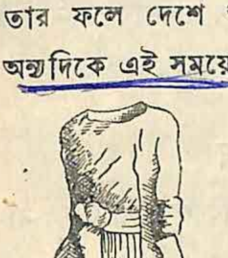
াচিত্রগুলো গুপ্ত রাজত্বকালে অঙ্কিত হয়েছিল এবং মহাকবি লিদাসের অমর নাটক ও কাব্য-মূহ এই সময়ে রচিত হয়েছিল লে পণ্ডিতেরা মনে করেন। চীনা রিব্রাজক ফা হিয়েন-এর বিবরণ থেকে এই সময়ের ভারতের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।



অজন্তার গুহা-চিত্র

কুষাণ রাজ্য

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সারা দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সময়ে একদিকে গড়ে ওঠে শক্তিশালী গুপ্ত সাম্রাজ্য। তার ফলে দেশে স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির একটি যুগ দেখা দেয়। অন্যদিকে এই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কুষাণ নামক একটি রাজবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কুষাণগণ ছিলেন যাযাবর ইউ চি জাতির একটি শাখা। রাজা প্রথম কদফিসিস এবং দ্বিতীয় কদফিসিস এই কুষাণ রাজ্য শাসন করতেন। তবে কুষাণ-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কণিষ্ক। পুরুষপুর বা বর্তমান পেশোয়ার ছিল কণিষ্কের রাজধানী। চীন ও তিব্বতীয় কাহিনীতে সম্রাট কণিষ্ক সম্পর্কে অনেক কথা উল্লিখিত রয়েছে।



কণিষ্ক

কণিষ্কের আমলের অনেক তাম্রলিপি ও মুদ্রা থেকে জানা গেছে যে ঐ সময়ে কুষাণরাজ্য বিরাট অঞ্চলে

বিস্তৃত ছিল। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি বৌদ্ধ-ধর্মের একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কণিষ্কের রাজ্যভার গ্রহণের সময় থেকে শকাব্দ নামে একটি নূতন অব্দের প্রচলন হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। আলবিরুণি ও হিউয়েন সাঙ প্রভৃতি বিখ্যাত পর্যটকেরা কণিষ্কের রাজত্বকাল সম্বন্ধে নানা কথা লিখে গেছেন। কণিষ্কের রাজত্বকালে তাঁর উদ্যোগে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের একটি 'মহাসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কণিষ্কের রাজত্বকালে শিল্প, সাহিত্য ও ভাস্কর্যের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়। ঐ সময়ে বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, চরক প্রভৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিত-গণ বহু বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। কণিষ্কের রাজত্ব-কাল ভারত ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় বলে গণ্য হয়।



কণিষ্কের মুদ্রা

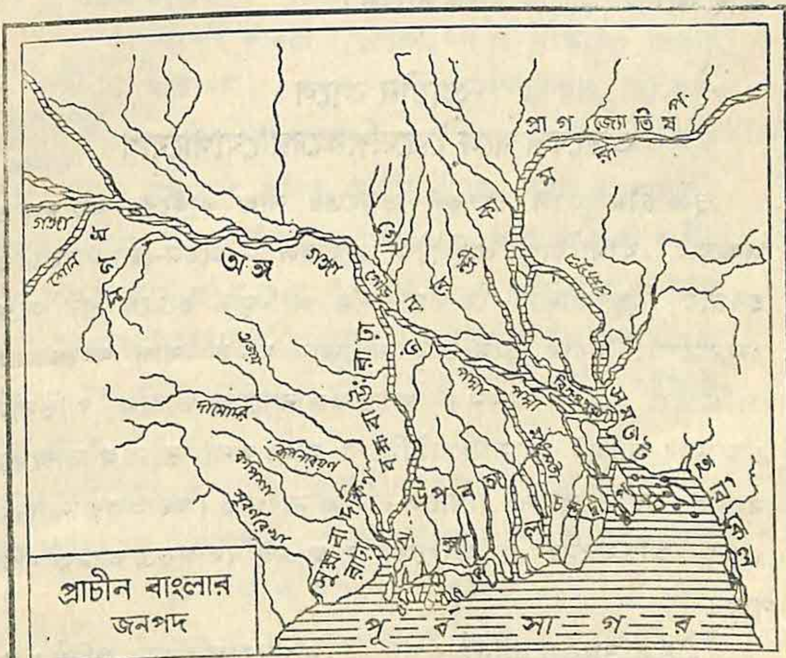
কণিষ্কের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই কুষাণ রাজ্যের পতন ঘটে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারত হুণ আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

প্রাচীনকালে সারা বাংলা-দেশের একটি বিশেষ নাম ছিল না। আজ যাকে আমরা বঙ্গদেশ বলে জানি (পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ সহ) এ রকম একটি সুনির্দিষ্ট ভূভাগ প্রাচীন কালে ছিল না। উত্তরে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রী, দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি, দক্ষিণ-পূর্বে সমতট, হরিকেল, বঙ্গ ও বঙ্গাল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে নানা অঞ্চল পরিচিত ছিল। তাছাড়াও পশ্চিম বাংলার কিছু অংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল।

জন-বসতির দিক থেকে প্রাচীন বাংলার জনসাধারণ আর্য ও অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় জনসমষ্টির চেয়ে পৃথক বলেই পণ্ডিতেরা

অনুমান করেছেন। বৈদিক যুগের শেষ দিকে রচিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক ও বোধায়ন 'ধর্মসূত্রে' বলা আছে যে পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশ অনার্য দস্যুদের বাসভূমি ছিল। এই সব মন্তব্য থেকে প্রাচীন বঙ্গদেশ বৈদিক আর্যদের প্রভাব-মুক্ত ছিল বলে বোঝা যায়। আর্যগণের বসতি স্থাপনের আগেই ভিন্ন জাতির লোকেরা বাংলায় বসবাস করতেন—নৃতত্ত্ববিদেরা এবং ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতেরা এটা স্বীকার করেছেন। আর্যজাতির সংস্পর্শে আসার আগেই বাংলায় স্বতন্ত্র সভ্য জনগোষ্ঠী বাস করতেন এই মত এখন স্বীকৃত হয়েছে।



বৈদিক 'ধর্মসূত্রে' ও 'মহাভারতে' এবং 'পুরাণে' বাংলাদেশের বিভিন্ন উল্লেখ রয়েছে। জৈনদের "প্রজ্ঞাপনা" নামক গ্রন্থে 'বঙ্গ' ও 'রাঢ়ের' উল্লেখ রয়েছে। জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর বঙ্গদেশে ধর্ম-প্রচারে এলে এখানকার অধিবাসীরা তাঁকে আক্রমণ করে এবং 'ছু ছু'

শব্দ করে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল বলে জৈনদের প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মহাভারত'-এর তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে করতোয়া নদীর তীর ও "গঙ্গাসাগর-সঙ্গম" পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলে বর্ণিত হয়েছে। রামায়ণে সমৃদ্ধ জনপদের তালিকায় 'বঙ্গের' নাম রয়েছে। প্রাচীন কালের বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার কাজ খুবই কঠিন। তবু পণ্ডিতদের চেষ্টার ফলে বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাসের একটি কাঠামো এই সব নানা সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে।

ভারতের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও মহাকাব্যে বাংলার কথা

প্রাচীন কালে ভারতের সঙ্গে বৈদেশিকদের যোগাযোগ

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সঙ্গে বাইরের বহুদেশ ও অঞ্চলের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহেন-জো-দাড়ো ও হরপ্পায় সিন্ধুসভ্যতার যে ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তার সঙ্গে মেসোপোটেমিয়ার সুমেরদের সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। আলেকজান্দারের ভারতে অভিযান চালাবার আগেই মেসোপোটেমিয়ার নানা অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা গেছে। আলেকজান্দারের ভারত অভিযানের পর ভারতের সঙ্গে এই যোগসূত্র অনেক বৃদ্ধি পায়।

মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর এই যোগাযোগ অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সম্রাট অশোক পাঁচজন বিদেশী রাজার রাজ্যে ধর্ম-প্রচারকদের পাঠিয়েছিলেন বলে তাঁর শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে সিরিয়া, মিশর ও গ্রীসদেশ ছিল। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরে বৌদ্ধধর্মের চর্চা ছিল। ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থানের পূর্বে পশ্চিম এশিয়ার নানা অঞ্চলে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের

যথেষ্ট প্রভাব ছিল। পারস্য, সিরিয়া ও এশিয়ামাইনরের মধ্য-দিয়ে স্থলপথে ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। প্রাচীনকালে ভারতীয় নাবিকেরা জলপথে বিদেশে পণ্যাদি নিয়ে যেতেন। আলেকজান্দ্রিয়া ছিল এই বাণিজ্য পথের একটি প্রধান কেন্দ্র।

অন্যদিকে ভারতীয় বণিকেরা চীনদেশ পর্যন্ত যাতায়াত করতেন তার অনেক প্রমাণ নানা পর্যটকদের রচনায় পাওয়া গেছে। বাণিজ্যের সূত্রধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কয়েকটি ভারতীয় রাজবংশের রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। কম্বুজ অর্থাৎ কাম্পুচিয়ায় আংকর-ভাটের বিষ্ণুমন্দির ও আংকর-ধাম ভারতীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

ভারত ও চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সুমাত্রা, যাভা ও বালিদ্বীপে বৌদ্ধ শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ঐ রাজারা বারবুদরের বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপটি নির্মাণ করেছিলেন। এইসব অজস্র তথ্য থেকে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল তা জানা যায়।

ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র মধ্য-এশিয়াই কণিষ্কের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মধ্য এশিয়ার বিরাট অঞ্চলই এখন মরুভূমি। এই মরু-অঞ্চলে খনন কার্য চালিয়ে বিখ্যাত প্রত্ন-তত্ত্ববিদ **স্যার ওরেলস্টাইন** ভারতের সঙ্গে এই অঞ্চলের প্রাচীন যোগাযোগের বহু তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এই অঞ্চলে ভারতের ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম প্রচুর সমাদর লাভ করেছিল। স্যার ওরেলস্টাইন মধ্য-এশিয়ায় বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার, বুদ্ধ ও বহু দেবদেবীর মূর্তি

ভারত ও মধ্য-এশিয়া

এবং প্রাচীন ভারতীয় লিপি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর আবিষ্কার থেকে জানা গেছে মধ্য-এশিয়ায় খোটান অঞ্চলে কয়েকটি ভারতীয় উপনিবেশও গড়ে উঠেছিল। চীনা ভ্রমণকারী হিউয়েনসাঙও খোটান অঞ্চলে বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা বলে গেছেন।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সঙ্গে ভারতের বাইরের নানা দেশ ও অঞ্চলের গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এইসব আবিষ্কার ও কাহিনী থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সব যোগাযোগের ফলে ঐসব দেশে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও শিল্পকলা খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বিদেশী ভ্রমণকারীদের রচনায় ভারতের সমাজ-চিত্র

ভারতের প্রাচীন কালের ইতিহাসের কাহিনী ও ঘটনাবলী জানার একটি নির্ভরযোগ্য উপায় হচ্ছে ভ্রমণকারী বিদেশীদের লিখিত বিবরণ। অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা, গ্রীক ভ্রমণকারী মেগাস্থিনিস এবং চীনা পর্যটক ফা হিয়েন-এর লিখিত ভারত সম্পর্কিত বিবরণ পাওয়া গেছে। এঁদের বিবরণ থেকে ঐ সময়ের ভারতের একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায়।

মেগাস্থিনিস এর বিবরণ

মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গ্রীকপণ্ডিত মেগাস্থিনিস ভারতে ছিলেন। গ্রীক সেনাপতি সেলিউকাস-এর দূত হিসাবে তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় ছিলেন। ভারতে অবস্থান-কালে তিনি ভারতের সামাজিক অবস্থা, মৌর্য-শাসনপদ্ধতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনেক কথা লিখে গেছেন। তাঁর রচিত একটি বিবরণ 'ইণ্ডিকা' নামে একটি পুস্তকে লিখিত রয়েছে। পুরো বিবরণটি পাওয়া যায় নি এবং অন্যান্য লেখকদের বইয়ের উধৃতি থেকে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। তবু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে এই রচনাটি খুবই মূল্যবান।

মেগাস্থিনিস-এর বিবরণ থেকে ঐ সময়ের ভারতের সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজধানী পাটলিপুত্র নগর সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে। পাটলিপুত্র নগর ও মৌর্য রাজপ্রাসাদের সুন্দর বর্ণনা মেগাস্থিনিসের বিবরণে পাওয়া গেছে। নগরটি লম্বায় ছিল প্রায় সাড়ে নয় মাইল এবং প্রস্থে ছিল প্রায় পৌনে দু'মাইল লম্বা। নগরের চারপাশে একটি প্রশস্ত ও গভীর পরিখা ছিল। এই প্রাচীরের স্থানে স্থানে বহু তোরণ ও গম্বুজ ছিল। ঐ সময়ে সমুদ্র ও নদীর তীরবর্তী ঘরবাড়ীগুলো ছিল কাঠের নির্মিত। দেশের ভেতর দিকে ইট ও সুরকী দিয়ে বাসগৃহ নির্মিত হত। শুধু রাজধানী পাটলিপুত্র নয় উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের নানা নগরের বর্ণনাও মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে রয়েছে।

একজন বিদেশী পর্যটকের পক্ষে ঐ সময়ের ভারতের সবকিছু ভালোভাবে বোঝা খুবই কঠিন ছিল। তবু মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে আংশিকভাবে হলেও প্রাচীন ভারতের একটি নির্ভরযোগ্য সুন্দর চিত্র পাওয়া গেছে। এই হিসাবে মেগাস্থিনিস-এর বিবরণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল।

ফা হিয়েন-এর বিবরণ

গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে চীনদেশীয় পর্যটক ফা হিয়েন ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। গোবি মরুভূমির দক্ষিণ দিক দিয়ে মধ্য-এশিয়ার খোটান হয়ে পামীর পর্বতমালা অতিক্রম করে ফা হিয়েন ভারতে এসেছিলেন। ৪০১ থেকে ৪১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দশ বছর তিনি ভারতে ছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যে প্রায় ছয় বছর কাটিয়ে জলপথে সিংহল ও যবদ্বীপ হয়ে ফা হিয়েন দেশে ফিরে যান। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসন সম্পর্কে ফা হিয়েন উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। গুপ্তরাজাদের শাসনবিধি খুবই উদার ছিল। কোন অপরাধের জন্যই প্রাণদণ্ড দানের ব্যবস্থা ছিল না। ফা হিয়েন-এর বিবরণ থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যে যে সুশাসন ছিল তা বোঝা যায়।

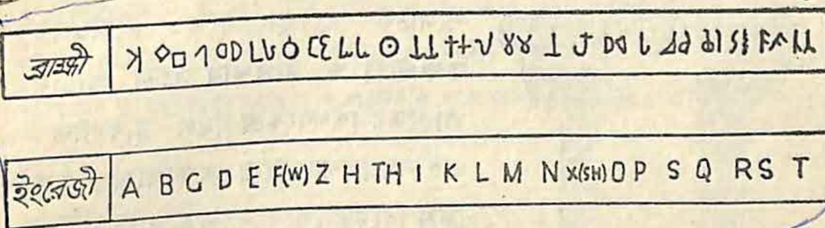
পাটলিপুত্র নগরে অশোকের রাজধানী দেখে ফা হিয়েন মুগ্ধ হয়েছিলেন। পাটলিপুত্র নগরে দুটি বড় শিক্ষাকেন্দ্রের কথা তিনি উল্লেখ করে গেছেন। ফা হিয়েন দেশে অনেক ধর্মশালা ও চিকিৎসালয় দেখতে পেয়েছিলেন। এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে বিনামূল্যে খাদ্য ও ঔষধ দরিদ্র জনসাধারণকে দেওয়া হত। গুপ্ত-সম্রাটরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুরাগী হলেও দেশে পুরো ধর্মীয় সহনশীলতার মনোভাব বজায় ছিল। ফা হিয়েন দেশভ্রমণ কালে বহু বৌদ্ধ মঠ দেখতে পেয়েছিলেন। এই মঠগুলোতে হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বসবাস করতেন এবং তারা স্বাধীনভাবেই ধর্মপালন করতেন। দেশের বহু অংশেই বৌদ্ধদের প্রচুর প্রভাব ছিল। প্রাণীহত্যা হত না বললেই চলে। শহরে মদ ও মাংসের কোনো দোকান ছিল না। সমাজে জাতিভেদ প্রথা দেখা দিয়েছিল। 'চণ্ডাল' নামক নিম্নজাতির লোকদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হত এবং বাজারে ও শহরে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল না। সাধারণভাবে জনসাধারণ খুবই শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। দেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য বহু রাজপথ ছিল ; স্থানে স্থানে পথের পাশে পাশে অনেক সরাইখানা স্থাপিত হয়েছিল।

ফা হিয়েন-এর ভারত-বিবরণ গুপ্তযুগের অবস্থা জানার দিক থেকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল। ফা হিয়েন নিজে ছিলেন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ; বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'বিনয় পিটক'-এর মূল রচনাটি সংগ্রহ করার জন্য তিনি ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি উদার মন নিয়ে ঐ সময়ের ভারতের একটি সুন্দর বিবরণই লিখে গেছেন। তাঁর বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য তাই খুবই বেশী।

প্রাচীন ভারতের
সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য ও বিজ্ঞান

মেগাস্থিনিস ও ফা হিয়েন-এর মতো বিদেশীয়দের বিবরণ থেকে নয়, ভারতের প্রাচীন পুথি ও গ্রন্থাদি থেকেও প্রাচীন ভারতে নানা

ক্ষেত্রের অগ্রগতির অনেক নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে কৌটিল্যের রচিত 'অর্থশাস্ত্র' খুবই প্রসিদ্ধ। বৈদিক সাহিত্য, 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধির চিত্র পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস-এর বহু নাটক, অশ্বঘোষ-এর 'বুদ্ধচরিত' এবং অন্যান্য বহু রচনাতেও ভারতের প্রাচীনযুগের জ্ঞানচর্চার উন্নত চিত্র পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও বিকাশের



ব্রাহ্মী লিপি ও রোমান তথা ইংরাজী লিপির নিদর্শন

ক্ষেত্রে এই যুগ খুবই উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মী লিপির এই যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

বৈদিক যুগ থেকে ভারত ছিল মুখ্যতঃ কৃষি-নির্ভর। পশুপালন ছিল খুবই ব্যাপক এবং নানা প্রকার হস্ত শিল্পের বিশেষ করে বস্ত্র-বয়ন শিল্পে ভারতে প্রচুর অগ্রগতি হয়েছিল। প্রাচীনকাল থেকেই গৃহনির্মাণ ও স্থাপত্য বিদ্যায় আর্যগণ সুদক্ষ ছিলেন। তারই সূত্রে জ্যামিতি ও গণিত বিদ্যার প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের বহু মন্দির, স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষ নির্মাণে ভারতীয় শিল্পীরা প্রচুর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সাঁচিস্তূপের তোরণ ও অশোক-স্তম্ভের শিল্পকৌশল অপূর্ব শিল্পকীর্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।



অশোক স্তম্ভশীর্ষ

অশোকের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখে ফা হিয়েন মুগ্ধ হয়ে

বলেছিলেন "এ কাজ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ; তা দৈত্য-দানবের সৃষ্টি বলেই মনে হয়।" দর্শন ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের অবদান বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। মহাকবি কালিদাসের নাটকগুলো এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতদের অজস্র রচনা প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের অকাট্য প্রমাণ। প্রাচীন ভারতে বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষাদানের সংগঠিত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তক্ষশীলা ও নালন্দার মতো প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল সুবিখ্যাত। এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভের জন্য দেশ বিদেশ থেকে পণ্ডিত ও বিদ্যার্থীরা এসে সমবেত হতেন।



সাঁচিস্তূপের তোরণদ্বার

এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় ভারতের কৃতিত্ব ও অগ্রগতি সুপরিচিত। নক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত প্রভৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত খুবই উন্নত ছিল। প্রাচীন ভারতে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে গণিতের শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। সংখ্যার ব্যবহার, ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে গণিতবিদ্যার খুবই সমাদর ছিল। বৈদিক যুগের 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষ' গ্রন্থে গণিতবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠবিদ্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসা-বিদ্যার ক্ষেত্রে 'চরক-সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত সংহিতা' এই যুগের দু'খানি স্মরণীয় গ্রন্থ। বিভিন্ন দ্রব্যের উপাদান ও তার রাসায়নিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদশাস্ত্র ঐ সময়ে প্রচুর উন্নতি লাভ করেছিল। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান খুবই কাজে লেগেছিল। শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রেই নয় সঙ্গীত, শিল্প ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। 'অজন্তা'-র গুহাচিত্রগুলোর কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ করা চলে।

প্রাচীন ভারতে সাহিত্য, শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞান

অনুশীলনী

ও

বিষয়মুখী নানা প্রশ্নের আদর্শ

[মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ক্রমঃবিকাশের আলোকে ইতিহাস পঠন-পাঠনের সচেতন আয়োজন ব্যাপকভাবে এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ শুরু করেছেন। আমরা তাই সযত্নে কিছু অনুশীলনী ও আদর্শ-প্রশ্ন নীচে অধ্যায়গতভাবে সংকলন করে দিলাম। মাননীয় শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীরা এতে খুবই লাভবান হবে বলে আমরা মনে করি।]

প্রথম অধ্যায় ঃ

১। ইতিহাস বলতে কী বুঝো? ইতিহাস পড়ে কী লাভ?

২। প্রাচীনকালের কাহিনী কিভাবে জানা যায়?

৩। প্রত্নতত্ত্ব বা পুরাতত্ত্ব কাকে বলে? 'ফসিল' কাকে বলে?

৪। খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত শিলালিপি, তাম্রলিপি, জীবজন্তুর কংকাল, মুদ্রা, হাতিয়ার-পাতি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি থেকে ইতিহাসের জ্ঞান-লাভের দুই একটি দৃষ্টান্ত দাও।

৫। (ক) রাজা সমুদ্রগুপ্তের একটি মুদ্রাতে দেখা গেল তাঁর হাতে একটি বীণা রয়েছে। তা থেকে তোমার কী মনে হয়?

(খ) একটি ঘটনা ৩২৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ঘটেছিল বলতে তুমি কী বুঝবে?

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

আদিম মানুষের কথা এবং প্রস্তর যুগ

১। (ক) আদিমকালে মানুষ কখন আগুন জ্বালাতে শিখেছেন বলে তোমার মনে হয়?

(খ) 'পিকিংম্যান' আগুন ব্যবহার করতে জানতেন এটা কিসের থেকে বোঝা যায়?

২। প্রস্তর যুগ কাকে বলে? পুরাতন ও নূতন প্রস্তরযুগের হাতিয়ারের মধ্যে কী পার্থক্য চোখে পড়ে?

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

তামা ও ব্রোঞ্জের যুগ

১। (ক) ধাতুর ব্যবহারকে ইতিহাসে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন ?

(খ) মানুষ সবার আগে কোন্ ধাতু ব্যবহার করেছিল বলে মনে ?

(গ) কোন্ কোন্ ধাতু মিলিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরী হয় ? ব্রোঞ্জ ও তামার তৈরী জিনিসের মধ্যে পার্থক্য কী ?

২। ধাতুর ব্যবহার আদিম মানুষের শিকার ও কৃষিকাজের ব্যাপারে কিভাবে সাহায্য করেছিল ?

৩। (ক) কৃষিকার্য কিভাবে মানুষের সমাজে যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিয়েছিল ?

(খ) ধাতুর ব্যবহার ও কৃষিকার্য কিভাবে মানুষের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল বলো তো ?

(গ) পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলো বড় বড় নদনদীর তীরে তীরে প্রথমে গড়ে উঠেছিল কেন ?

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

এক ঃ

১। 'মেসোপোটেমিয়া' কথাটির অর্থ কী ? টাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস নদী দুটির তীরে যে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার কারণ কী ? এই নদী দু'টির মিলন-ক্ষেত্রকে প্রাচীনকালে কী বলা হত ?

২। (ক) 'রেখা-চিত্রের' ভাষা কিভাবে ও কেন ব্যবহৃত হয়েছিল ?

(খ) 'কুমোরের চাক'-এর ব্যবহারের ফলে কী সুবিধে হয়েছিল ?

দুই ঃ

১। (ক) মিশর দেশ-কে নীলনদ-এর দান বলা হ'ত কেন ?

(খ) কী কী সুবিধের জন্য মিশরে এমন প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ?

(গ) মিশরের রাজাদের কী বলা হ'ত ? (ঘ) প্রাচীন মিশরে পুরোহিতদের এমন প্রবল প্রভাব ছিল কেন ? সমাজে দেবদেবীদের এত

প্রভাব কেন ছিল ? (ঙ) প্রাচীন মিশরের চিত্র-নির্ভর ভাষার ব্যবহারকারী 'লিপিকার'-দের এত গুরুত্ব কেন দেওয়া হত ?

২। (ক) মিশরের 'মমি' কী বলো তো ? মৃতদেহ কেন 'মমি' করে রাখা হ'ত ? (খ) পিরামিডগুলো আসলে কী ? (গ) স্ফিংকস্ কী ? 'স্ফিংকস-এর হাসি' মানে কী ?

৩। প্রাচীন মিশরীয় সমাজের প্রধান ভাগগুলো কী কী ? মিশরের দাসদের জীবন কেমন ছিল ?

তিন ঃ

১। (ক) প্রাচীন ভারতের সিন্ধু-সভ্যতা কত প্রাচীন তা কী ভাবে জানা গেছে ? (খ) 'মহেনজোদাড়ো' কথাটির অর্থ কী ? তা কোথায় অবস্থিত ? (গ) সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কারকদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদের নাম কর।

২। (ক) মহেনজোদাড়ো-র নগরজীবন সম্বন্ধে কী জানা যায় ? (খ) মহেনজোদাড়ো-র শীলমোহর থেকে কী বোঝা যায় ? (গ) সিন্ধুসভ্যতার সময়ে অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কী জানো ?

৩। (ক) মহেনজোদাড়ো-তে জনস্বাস্থ্য রক্ষার কী কী ব্যবস্থা ছিল বলে মনে হয় ? (খ) মহেনজোদাড়ো-র স্নানাগারের ভগ্নাবশেষ থেকে কী বোঝা যায় ? (গ) সিন্ধুসভ্যতা কেন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ? অনার্য সভ্যতা বলতে কী বোঝো ?

চার ঃ

১। (ক) চীনের প্রাচীন সভ্যতা কত প্রাচীন তা কী করে জানা যায় ?

(খ) 'পিকিংম্যান' কাদের বলে ?

(গ) যে নদী দুটির তীরে প্রাচীন চীনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই নদী দুটির নাম কী ? হোয়াং হো-কে কেন 'চীনের দুঃখ' বলা হত ? প্রাচীন-কালে বন্যার-দুঃখ কমানোর জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ?

২। (ক) 'কম্পাস' কাকে বলে ? চীনে প্রথম কম্পাস আবিষ্কৃত হয়েছিল— এ থেকে কী বোঝা যায় ? তা কী কাজে লাগে ?

(খ) চীনের ভাষার বৈশিষ্ট্য কী কী ?

পাঁচঃ

১। তোমার জানা পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে মিল কোথায় কোথায়? সভ্যতাগুলোর মধ্যে এরকম মিল কেন দেখা দিয়েছিল?

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

১। ধাতু হিসাবে লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহারের গুরুত্ব কী কী-ভালো করে বুঝিয়ে বলো।

একঃ

১। ব্যাবিলন কোথায়? ব্যাবিলন-এর সভ্যতা সম্পর্কে কী জান?

২। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাবিলন-এর বিশেষ দান কী কী?

৩। হামবুরাবি কে ছিলেন? হামবুরাবির অনুশাসন বলতে কী বুঝো?

৪। হামবুরাবি-র অনুশাসনের থেকে ঐ সময়ের সমাজের কী ছবি পাওয়া যায়? যে কোনো একটা অনুশাসনের উল্লেখ করে তা থেকে কী বুঝলে বলতে পারো?

দুইঃ

১। প্রাচীন মিশরে কৃষিকার্যের কী কী সুবিধে ছিল? হাড়ের লাঙল ও নিড়ানি, ফসল মাড়াইয়ের জন্য পশুর ব্যবহার, ধাতু গলিয়ে তৈরী-করা কুড়াল ও কুড়ালের ছাঁচ-এর ছবি তোমার বইয়ে রয়েছে তা-থেকে কী বোঝা যায়?

২। কাদের দেশকে 'নুবিয়া' বলা হত? নুবিয়া জয়ের ফলে মিশরের রাজাদের কী সুবিধে হয়েছিল?

৩। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন মিশরের দান কী কী? ইংরেজী 'পেপার' কথা কী থেকে এসেছে? ঐ কাগজেব ব্যবহারের ফলে কী সুবিধে হয়েছিল?

তিনঃ

১। (ক) প্রাচীন পারস্য সম্বন্ধে কী জান? পারস্য দেশের বর্তমান নাম কী?

(খ) প্রাচীন পারস্যের ধর্ম সম্পর্কে কী জানো?

২। (ক) প্রাচীন পারস্যের রাজারা গ্রীস জয়ের জন্য কেন চেষ্টা করেছিলেন?

(খ) থার্মোপলি ও ম্যারাথন-এর যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কাদের জয় হয়েছিল ?

(গ) ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। সেই গ্রীক দৌড়-বীরের কী নাম ?

(ঘ) হিরোদোতাস-কে 'ইতিহাসের-জনক' বলা হয় কেন ?

চার ঃ

১। মোজেস কে ছিলেন ? 'তাঁর নেতৃত্বে ইহুদিগের মুক্তি-অভিযান হয়েছিল'-বললে কী বোঝো ?

২। 'হিব্রু বাইবেল' বলতে কী বোঝো ? বাইবেল-এর অনেক ধর্মসঙ্গীত একজন ইহুদি রাজার রচিত ; তাঁর নাম কী ?

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

১। গ্রীস দেশের সভ্যতা-কে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন ?

২। গ্রীস দেশ কোথায় অবস্থিত ? গ্রীস দেশের ভৌগলিক অবস্থান কিভাবে গ্রীসের সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছিল ? ভূমধ্যসাগরের 'গ্রীক-উপনিবেশগুলো' গ্রীস দেশের জাতীয় জীবনে কী প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

৩। কী জানো বলো তো ?

(ক) নগররাষ্ট্র (খ) গণতন্ত্র (গ) স্পার্টায় লাইকাগাসের প্রচলিত রীতিনীতি (ঘ) এথেন্স-এর পেরিক্লিস প্রবর্তিত জীবনধারা (ঙ) সোলন-এর সংস্কার।

৪। (ক) সক্রেটিস কে ছিলেন ? সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্তোতল এদের মধ্যে সম্পর্ক কী ? কে কার গুরু বা শিষ্য ছিলেন ?

৫। (ক) প্রাচীনকালে গ্রীক দেশের কয়েকজন নাট্যকারের নাম কর।

(খ) প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত কয়টি ভাস্কর্য ও মন্দিরের নাম কর।

(গ) গ্রীস দেশের ক্রীতদাসদের সম্পর্কে কী জান ?

৬। (ক) মাসিডন-এর রাজা ফিলিপ কিভাবে সারা গ্রীস দেশ দখল করেছিলেন ?

(খ) আলেকজান্দার কে ছিলেন ? আলেকজান্দারের গৃহ-শিক্ষক কে ছিলেন ?

(গ) আলেকজান্দারের দিগ্বিজয় সম্পর্কে কী জান? তার ফলাফল কী হয়েছিল?

সপ্তম অধ্যায়ঃ

১। রোম নগরী কোথায় অবস্থিত? কার নাম অনুসারে রোম নগরীর নাম করা হয়েছে?

২। 'প্লিবিয়ান' ও 'প্যাট্রিসিয়ান' কথা দু'টি সমাজের কোন্ কোন্ অংশের লোকদের বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হত?

৩। (ক) 'রোম' ও 'কার্থেজ'-এর বিরোধ কেন দেখা দিয়েছিল? (খ) তিনটি পিউনিক যুদ্ধ মোট কত বছর চলেছিল? (গ) 'পিউন' কাদের বলা হত?

৪। (ক) রোমের দাসপ্রথা সম্বন্ধে কী জান?

(খ) 'গ্লেডিয়েটর' কাদের বলা হত? একজন গ্লেডিয়েটর-এর জীবন কী রকম ছিল?

(গ) স্পার্টাকাস কে ছিলেন? স্পার্টাকাস-এর নেতৃত্বে যে দাসবিদ্রোহ হয়েছিল তার ফল কী হয়েছিল?

৫। জুলিয়াস সীজার কে ছিলেন? কেন তাকে হত্যা করা হয়েছিল? কারা তাকে হত্যা করেছিলেন? তাদের ইচ্ছা কি পূর্ণ হয়েছিল?

৬। অগাস্টাস কে ছিলেন? তাঁর সময়ের রোমের সভ্যতা সম্পর্কে কী জান?

৭। যীশুখৃষ্ট কে ছিলেন? তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল কথাগুলো কী কী? রোমের সম্রাটদের খৃষ্টধর্মের প্রতি মনোভাব কখন বদল হয়?

অষ্টম অধ্যায়ঃ

১। 'চীনের প্রাচীর' কী? কোন সম্রাটের রাজত্বকালে এই প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল? কেন এই প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল?

২। কনফুসিয়াস কে ছিলেন? তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটি পরিচয় দাও।

নবম অধ্যায়ঃ

১। (ক) 'আর্য বলতে কী বোঝানো হয়? আর্যরা কারা? তারা কোথা

থেকে ভারতে এসেছিলেন বলে মনে করা হয়? (খ) আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কী? তার বিভিন্ন ভাগ-বিভাগগুলো কী কী? উপনিষদ কী? তাকে কেন 'বেদান্ত' বলা হয়? (গ) বৈদিকসভ্যতা বললে কী বোঝো? (ঘ) 'বর্ণাশ্রম' কাকে বলে ও চারটি 'বর্ণ' কী কী? তা থেকে ঐ সমাজের কী চিত্র পাওয়া যায়?

২। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' আমাদের কাছে এত আদরের কেন? এই দুই মহাকাব্য থেকে আমরা কী জানতে পারি? প্রাচীন ভারতের যে ছবি এই দুই মহাকাব্যে পাই তা তোমার ভালো লাগে কেন?

৩। (ক) জৈন ধর্মের প্রবর্তক কে? (খ) বুদ্ধদেব সম্পর্কে কী জান? তাঁর প্রচারিত ধর্ম-সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। (ক) প্রধান প্রধান কয়েকজন মৌর্য সম্রাটের নাম কর। (খ) মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? (গ) কৌটিল্যে 'অর্থশাস্ত্র' থেকে কী জানা যায়? (ঘ) মেগাস্থিনিস কে ছিলেন? তার লিখিত বইয়ের কী নাম? এই বই থেকে চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কী জানা যায়?

৫। (ক) সম্রাট অশোককে ভারতের ও পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন? (খ) অশোকের শিলালিপি বলতে কী বোঝো? তা থেকে কী জানা যায়?

মহারাজ কণিষ্ক কে ছিলেন? কুষাণ বংশের রাজাদের মধ্যে কণিষ্ককে সবচেয়ে বড় কেন বলা হয়।

৭। (ক) গুপ্তরাজবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের নাম কর। (খ) সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সম্পর্কে সংক্ষেপে যা জান লেখো। (গ) ফা-হিয়েন কে ছিলেন? কবে তিনি ভারতে এসেছিলেন?

৮। প্রাচীনকালের বাংলাদেশ সম্পর্কে কিভাবে জানা যায়? প্রাচীন বাংলাদেশের মানুষেরা আর্যদের চেয়ে পৃথক ছিলেন কিভাবে তা বোঝা যায়?

৯। (ক) প্রাচীন ভারতের ক'জন বিজ্ঞানীর নাম কর। প্রাচীন ভারতে গণিত-বিদ্যা শিক্ষার ওপর খুবই জোর দেওয়া হত-এমন কোনো প্রমাণ তোমার জানা আছে? (খ) অজন্তার গুহাচিত্রগুলো কোন সময়ে আঁকা হয়েছিল?

—